গুঞ্জন

গুঞ্জন

গুঞ্জন

গুঞ্জন

গুঞ্জন

মাসিক ই-পত্রিকা

বর্ষ ২, সংখ্যা ৫
অক্টোবর ২০২০

জানিনা আসল ভক্তিরস ক'জনের মধ্যে থাকে, তবে আনন্দোচ্ছ্বাসে ভেসে যাবার প্রবণতা অধিকাংশ জনগণের মধ্যেই বিরাজমান। তাই, এবারের দুর্গাপূজায় হয়তো অনেক উচ্ছ্বাসী নিজেরই বলিদান দিয়ে ফেলতেন। যাই হোক, এদেশে এখনও আইন শৃঙ্খলা যে বেঁচে আছে, উচ্চ-আদালতের যুক্তিপূর্ণ বিধানে তার প্রমাণ পাওয়া গেল। মা কখনও সন্তানের অনিষ্ঠ চান না, তাই এবারে পুজো শেষ পর্যন্ত টেলিভিশন এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমেই দেখার ব্যবস্থা হল। যা হল তা ভালই হল...

কলম হাতে

পিনাকী রঞ্জন বিশ্বাস, দীপঙ্কর সরকার, অমিত নাগ, তাপস চক্রবর্ত্তী, শ্রেয়সী পাঁজা, ডাঃ অমিত চৌধুরী, সন্দীপ বাগ, স্বাগতা পাঠক, সামিমা খাতুন, প্রণব কুমার বসু এবং পাণ্ডুলিপির অন্যান্য সদস্যরা...

প্রকাশনা

পাণ্ডুলিপি (গল্প, কবিতা, গান, গদ্য ও নাটকের আসর)

বি.দ্র.: লিটল ম্যাগাজিন হিসাবে মুদ্রিত এই পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ হয় ইং ১৯৭৭ সালে...

যোগাযোগের ই-মেলঃ contactpandulipi@gmail.com

পায়ে পায়ে

"মন্দির বাহিরে কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট।।"

(বৈষ্ণব পদাবলীঃ- গোবিন্দদাস)

চলতি বছরে দুর্গা মায়ের প্রতিটি পূজা মণ্ডপের বাইরে কপাটের ন্যায় একটি নির্দিষ্ট বেড়াজাল নির্মাণ করা হয়েছে। তা ভেঙে বা পার করে সাধারণ মানুষের অবাধ প্রবেশ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। বর্তমান পরিবেশ ও পরিস্থিতির সাপেক্ষে এটি সত্যিই একটি যুক্তিপূর্ণ পদক্ষেপ হিসাবে বিবেচ্য। সেই কারণে ভক্তিপ্রাণ মানুষরা যেমন মায়ের সম্মুখে ধ্যান বা পূজার অর্ঘ নিবেদন করতে পারছেন না, তেমনি বিধর্মী ও আনন্দোচ্ছ্বাসী মানুষদের উপার্জনে এবং পূজা পরিক্রমায় পড়েছে ভাঁটা। তাই দেবীর আরাধনায় প্রতিমা আছে, পূজার নিয়ম-আচার আছে। কিন্তু সবটাকেই প্রায় আনন্দহীন প্রথা বজায় রাখা বলা যেতে পারে। দেবীর পূজার সাথে জড়িত আনুষঙ্গিক সবকিছুই প্রায় অনুপস্থিত। তাই দেবীর পূজার মাহাত্ম্য ও জাঁকজমকও একার্থে অর্ধেক। এই চিন্তাধারাকে মাথায় রেখে, এবারের 'গুঞ্জন'এর প্রচ্ছদটি পরিকল্পনা করা হয়েছে - যেখানে মায়ের অর্ধেক মুখাবয়ব প্রকটিত হয়েছে, আর বাকি অর্ধেকটা মুখাবয়ব বর্তমান সংকটে আনন্দময় জীবনের মতোই অন্তর্হিত। ■

বিনীতা –

রাজশ্রী দত্ত, সম্পাদিকা, গুঞ্জন

পুজোর ছবি

ছবির নামঃ করোনা কালে এলেন মা দুর্গা

শিল্পীঃ রিত্বিকা চ্যাটার্জি ✧ বয়সঃ ১১ বছর

সবাই জানাবেন এই উদীয়মান শিল্পীর ছবিটি কেমন লাগল...

কলম হাতে

কলম হাতে

গদ্যাংশের চিত্রগুলি লেখক-লেখিকাদের নিজেদের তোলা।

অনুগ্রহ করে সম্পূর্ণ পত্রিকাটি শেয়ার করুন।

বিদ্যাসাগর

তাপস কুমার চক্রবর্ত্তী

আজ আলোচনা সভায় সুশোভন উপস্থিত ছিল। সুশোভন শিল্পী মানুষ, ছবি আঁকে। নিজের আনন্দ বেদনা, আশা হতাশা সমস্ত অনুভব, রং তুলির মুখেই প্রকাশ করে। তাই এইসব আলোচনা সভায় সে নীরব, একনিষ্ঠ শ্রোতা। আজকের আলোচকদের মধ্যে থেকে এক একজন উঠছেন বক্তব্য রাখতে। তাঁদের অবস্থা দেখে সুশোভন বিস্ময়ে হতবাক।

এঁরা কেউ বিদ্যাসাগরকে চেনেনেই না। বিদ্যাসাগর আজকের দিনে, বাঙালী সমাজের কাছে একেবারে অজ্ঞাত! কারও কথায় এতটুকু আন্তরিক অনুভব নেই। শুধু গুগুল সার্চ করে মুখস্ত করা ক'টা নিষ্প্রাণ বাক্য মাত্র। অথচ ভাবে ভঙ্গিমায় নিজেকে বিশেষজ্ঞ বলে প্রতিপন্ন করতে মরিয়া।

সুশোভন ছবির জগতের লোক। এরকম পাবলিক দেখেনি এমন নয়। সেন্ট্রাল কোলকাতার কোনো প্রদর্শনশালায় বসে বসে, সে শুনেছে আঁতেলদের ছবি দেখে মন্তব্য করতে। ছুটির দুপুরে ছেলেমেয়ে নিয়ে বেড়াতে এসে কেউ কেউ ঢুকে পড়ে চিত্র প্রদর্শনির গ্যালারীতে। 'আমরা বাঙালী'র আন্তরিক অহংকার, কোনো বিষয় বুঝি না, এমন

হতেই পারে না। তাই শুধু চুপচাপ দেখে গেলে হবে না, সঙ্গীদের সঙ্গে নাতিউচ্চ স্বরে কিছু বিশেষজ্ঞের মতো মন্তব্য প্রকাশ করা চাই। আমাদের সাধারণ পাবলিক কখনই নিজেকে সাধারণ ভাবতে রাজি নই। যে কোন বিষয়ের সমালোচনা করতে সর্বদা দশ পা এগিয়ে আছি। আজকের আলোচনায় তেমনই সুশোভন শুনছে; কেউ বলছেন, আহা! অসাধারণ শিল্পী। কেউবা, অসাধারণ তুলির টান। কেউ হয়তো বললেন, কত বড় শিল্পীর শিষ্য। জানেন আমিও না, ওনার কাছে আমার মেয়েটাকে শেখাবো ঠিক করেছি। অন্য একজন আঁতলেমির পারা চড়িয়ে বলে উঠল, মুঘল আর্টের সঙ্গে বাংলার পট প্যাটার্ণের কি অসাধারণ মেলবন্ধন। আরও একজন বলল, এই এখানটায় দেখো, ঠিক যেন সালভাদর দালি, আর ঐ কোনটায়, স্ট্রোকটা যেন একদম পাবলো পিকাসোর তুলির টান। আরও এক বিশেষজ্ঞ দাড়ি চুলকে বলতে থাকলেন, বিমূর্ত ছবিও যেন কথা বলছে, এর মধ্যেও একটা গল্প আছে। ঠিক যেন কীটস-এর কবিতার মতো। সুশোভন প্রদর্শনশালার একটা কোণে বসে বসে, কাঁচা-পাকা দাড়ির জঙ্গলে চুরুট গুঁজে, নির্বিকার ফুঁ দিচ্ছে। অর্ধনিমীলিত চোখে কল্পনার লে-আউটের বুকে এদের প্রত্যেকের ভিতরটা এঁকে নিচ্ছে যন্ত্রনার আঁচড় কেটে কেটে। যখন নীরব শিল্পীকেও কিছু বলতে বাধ্য করা হল, তখন সুশোভন বলল, “আমার আঙুলে তুলি ছিল ঠিকই, তবে আমি জানিনা

চেতনা

ঐ পট কে আঁকলেন? আমার প্যালেটে অনেক রং অবশিষ্ট আছে, তবুও আমি জানি না, ঐ পটচিত্রে এতো বিচিত্র রং কে ভরে দিল? বিদ্যাসাগর এমনই একটা স্বতন্ত্র ও স্বতঃস্ফূর্ত সৃজন, এই আমাদের বিশ্বমানব সমাজে। সমাজের প্রয়োজন সময়ে সময়ে এভাবেই অনাগতকে আহ্বান জানায়, তখনই বিদ্যাসাগরের উদ্ভব সম্ভব হয়। ঠিক যেমন ক্যানভাসের আর্তি হয়ে কল্পনার আবেদন প্যালেটের অনাগত রংকে আসতে বাধ্য করে। উপেক্ষিত হয় বর্ণালীর যন্ত্রণা, তখন সার্থক হয় সৃজনশীলতার মর্মদাহ। আর যা কিছু এতক্ষণ শুনলাম, সবই উপলক্ষ্য মাত্র। প্রাচীন ঐতিহ্য ও তার ঐশ্বর্য্য নিয়ে সমসাময়িকতাকে চালিত করেছেন ভবিষ্যতে। বিদ্যাসাগর গণ্ডিবদ্ধ ভূগোলের পাতায় লিখে গেছেন বিশ্বৈকানুভুতির স্তোত্র। তিনি যেন বাংলা বাউলের সুর, আকাশ বাতাস পরিব্যপ্ত হয়েও ছড়িয়ে পড়েছেন চিদাকাশে। তাঁর বিস্তার উদারা মুদারা ছাড়িয়ে তারায়। তিনি যেন শিল্পীর তুলির গভীর অথচ সীমাহীন টান। যার শুধু বোধ আছে, দর্শন আছে কিন্তু দৃশ্য নেই। আজ পর্যন্ত আমরা সবাই তাঁরই বর্ণমালার অস্তিত্ব রক্ষার মাধ্যমে, একটা বৃহৎ স্মৃতির বিমূর্ত প্রবাহকে টিকিয়ে রাখার জন্য দায়বদ্ধ। সেই যে বৃহৎ বিমূর্ত জগতের সংক্ষিপ্ত মূর্তি তার মাধ্যমে আজও আমরা এই জগতের তরুলতা পশুপাখির সঙ্গে একটা জন্মান্তরের ঐক্য অনুভব করতে পারি।

চেতনা

‘কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন...’ অনেকেই নিজ নিজ জীবন পথে লক্ষবার হয়তো আবৃত্তি করেছি। কাজে লাগাতে পারিনি। বলা ভাল সে সদিচ্ছা আমাদের ছিল না। কিন্তু আবৃত্তি না করেও জীবন দিয়ে, কাজ দিয়ে, অনুভব দিয়ে যিনি এই আর্য-উক্তি সার্থক করলেন, পরাধীন দেশের বারুদ গন্ধি মাটিতে দাঁড়িয়ে, তিনি এক ও অনন্য বিদ্যাসাগর। ইংলিশ ডিসে সংস্কৃত পরমান্ন পরিবেশন করলেন, লোভী সমাজপতিদের কালসর্প জিহ্বায়।”

সুশোভনের বলা হয়ে যেতেই, সে উঠে বাড়ির পথ ধরল। তার ভিতরের কষ্টটা, ক্ষোভটা সবার কাছে প্রকাশিত হোক এটা তার কাম্য নয়। তার বাড়িতে আঁকার টেবিলের সামনে, একটা পোট্রেট, দেওয়াল থেকে এমন উচ্চতায় ঝোলানো আছে, যাতে গোটা ছবিটা একসাথে তার দৃষ্টি গোচর হয়।

‘আদর্শ’ সবকালে সব দেশেই বিমূর্ত। সেই আদর্শ যে সময় কালে মূর্তিমান হয়, মানব সভ্যতার ইতিহাসে তার গুরুত্ব অপরিসীম। সুশোভন দেখছে, এই ছবির মূর্তিটি আজও আমাদের কাছে বিমূর্ত ভাস্কর্য্যের মতোই, বেশীর ভাগ মানুষের অনুভবে অনাবিষ্কৃত থেকে গেল। সমাজ আর তার কুসংস্কারের কাঁথায় দাউ দাউ আগুন জ্বেলে দিল যে মূর্তিমান, তাকে কিনা ফুল মালার আড়ালে পাঠিয়ে, আজ আমরা শিক্ষা সভ্যতার ঠুনকো বড়াই করে চলেছি। তিনি নিজেই একটা বিশাল মাপের সমাজ গঠনের শিল্পী। তাঁর কাজ দিয়ে, তাঁর

করুণাময়তায় পাথরে ফুল ফুটিয়েছেন। ইস্পাত মুষ্ঠির আঘাতে সমাজ নামক গ্রানাইট গুঁড়িয়ে তাতে সভ্যতার মানব জমিন তৈরী করেছেন। পতিতোদ্ধারক এই শিল্পীর, দৃঢ় রংহীন তুলিটি চলতে গিয়ে আঘাতে আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়েছে, তুলির তন্তুগুলি কিন্তু ভোঁতা হয়ে যায়নি। খসে পড়েনি একটিও। দিনে দিনে তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হয়েছে। সভ্য মানুষের দর্শন স্বীকার করেছে, জ্ঞানের বৃহত্তর ভাণ্ডারও কোন সমাজের কোন কাজে আসে না, যদি না চরিত্রের দার্ঢ্য সপ্রমাণ হয়। তাঁর চিবুকের স্ট্রোকে শিল্পী এঁকেছেন চারিত্রিক দৃঢ়তা। কপালের বিস্তারে মূর্ত হয়েছে জ্ঞান সমুদ্রের সীমাহীন বালুকাবেলা। চোখের করুণ চাহনিতে নির্বিচারে সকল পীড়িতের জন্য করুণার কারুবাসনা – যে বাসনা যেখানে যত বঞ্চিত, লাঞ্ছিত সবার মুক্তি চাইছে। যত বাধা পাচ্ছেন ততই দৃঢ় হচ্ছে সংকল্প, তা চিত্রিত হয়েছে, কঠোর গণ্ডদ্বয়ের বিনির্মানে। একটি মুখাবয়বে এভাবে সমগ্র মানব সমাজের, সকল শুভ সংকল্প আঁকা যায়, তা কি কোন শিল্পীর জানা ছিল? একটি বিমূর্ত আধারে, একটি জাতিসত্ত্বার শিক্ষা সংস্কার ও চেতনার কর্ম নৈপুন্য মূর্ত হয়ে আছে। কুৎসা কলঙ্কের কাঁটা বিঁধে বিঁধে যে রক্ত ঝরে পড়েছিল মাটিতে, সেই মাটির মহিমায় এদেশের আকাশ বাতাস আর জল একত্র হয়ে নির্মাণ করেছিল একটা অবিস্মরনীয় আদর্শ চরিত্র দর্শনের মুর্ত সংস্করণ, তিনিই আমার আমাদের প্রতিদিনের স্মরণীয়, বিদ্যাসাগর মশাই। ■

পুজোর ছবি

ছবির নামঃ সংহারমূর্তিতে এলেন মা দুর্গা

শিল্পীঃ অর্ঘ্যদীপ সেনগুপ্ত ✧ বয়সঃ ২০ বছর

সবাই জানাবেন এই উদীয়মান শিল্পীর ছবিটি কেমন লাগল...

কোভিড ১৯ ও আমরা

বিজয় নারায়ণ চৌধুরী

কোভিড ১৯ বা করোনা ভাইরাস বললেই সাধারণ মানুষ থেকে বাচ্চারা পর্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে ওঠে... টিভি খুললেই শুধু করোনা ভাইরাসের খবর, এমন কি পত্রিকা খুললেও রোজ পৃথিবীতে কত আক্রান্ত আর কত মৃত তারই খবর... এই করোনা ভাইরাস বা কোভিড ১৯ প্রথম দেখা দেয় চীনের উহান শহরে 2019 সালের ডিসেম্বর মাসে, বিশ্বায়নের ফলে তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে উন্নত রাষ্ট্রগুলিতে – ইতালি, আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, স্পেন প্রভৃতি দেশে। এর ছড়িয়ে পড়ার ক্ষমতা যে অন্যান্য ভাইরাসের তুলনায় অনেক বেশি, তা ইতিমধ্যে সবারই জানা হয়ে গেছে, ফলে সব দেশই আতঙ্কিত।

প্রত্যেক শতাব্দীতেই নানা জীবাণুর মাধ্যমে পৃথিবীর নানা স্থানে দেখা দেয় মহামারী, এর কারণ সাধারণ মানুষের অজানা। দৈনিক পত্রিকায় অনেক ঘটনাই আলোচিত হয়েছে, কিন্তু ১৩৪৭ সালে ইউরোপে যে মহামারী হয়েছিল তার কোন আলোচনা সে ভাবে নজর কাড়েনি। আজ পর্যন্ত করোনা ভাইরাসে মৃত্যু তার ধারে কাছেও পৌঁছাতে পারেনি। এই মহামারীর নাম ব্ল্যাক ডেথ (BLACK DEATH), এই রোগও চীন থেকে উৎপন্ন হয়ে ইউরোপে এসেছিল, এটাকে প্লেগ

নামে চিহ্নিত করা হয়েছিল। চীনের এতে বিশেষ কোনো ক্ষতি হয়নি। কিন্তু ইউরোপের এক তৃতীয়াংশ মানুষ মারা যায় এই প্লেগ মহামারীতে।

ইংল্যান্ডেই মারা গিয়েছিল প্রায় ২৫ লক্ষ মানুষ। শহরের বড় বড় বাড়ি সব ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। এই মৃত্যু অবস্থাপন্ন মানুষের মধ্যেই থাবা বসিয়েছিল বেশি, এই মহামারী ভারসাম্য পাল্টে দিয়েছিল। এই সময় থেকেই ইংল্যান্ডে ইংলিশ যা এক সময় গরীবের ভাষা হিসাবে পরিচিত ছিল তা দেশের ভাষা হিসাবে ব্রিটিশ রাজন্যবর্গের মধ্যে গুরুত্ব পায়, যা পরে জাতীয় ভাষা হিসেবেও পরিণত হয়। এর আগে শিক্ষিত ও রাজন্যবর্গের মধ্যে নর্মানদের ভাষা প্রচলিত ছিল।

আমাদের দেশেও বারেবারে মহামারী দেখা গেছে। এজন্যই আমাদের দেশে একটা কথা আছে “আমরা মারি নিয়ে ঘর করি” প্লেগ, এশিয়াটিক কলেরা, পক্স, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগে আমাদের দেশে লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ হারিয়েছেন। প্লেগের মহামারীতে কলকাতায় অনেক লোক মারা যায়, স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা নিজের কথা না ভেবে অসুস্থদের সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, বহু লোক কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। এমন অবস্থা হয়েছিল যে, যাতায়াতের জন্য কলকাতার রাস্তায় তখন কোন যানবাহন পাওয়া যেত না। অনেকেই পদব্রজে পালিয়েছিলেন, আজকের অন্য রাজ্য থেকে ফিরে আসা শ্রমিকদের মত।

এবার আসি বর্তমান মহামারী করোনা ভাইরাসের কথায় - আমাদের দেশে করোনায় প্রথম আক্রান্ত যারা হয়েছেন তাদের বেশির ভাগের সঙ্গে রয়েছে বিদেশি যোগাযোগ। আমাদের রাজ্যেও তাই, দেশে সংক্রমণ বাড়তে থাকায় প্রধানমন্ত্রী ও বাংলার মুখ্যমন্ত্রী একযোগে সর্বাত্মক লকডাউন ঘোষণা করলেন। আমি একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে এটা সমর্থন করি, লকডাউনের ফলে দেশে কোভিড ১৯এর ছড়িয়ে পড়া কমলো, কিন্তু লকডাউন করার সময় দুজনেরই একটু ভাবা উচিত ছিল যারা কাজের জন্য বাইরে গিয়ে ঘরবন্দী হয়ে রয়েছেন তাদের কথা। লকডাউন এর ফলে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কাজ হারালো। তাদের বাড়ি ফেরাও বন্ধ এই অবস্থায় তাদের ভার নেওয়া উচিত ছিল দুই সরকারেরই। মতভেদ বাদ দিয়ে এইসময় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার মিলেই এই দায়িত্ব পালন করলে দুর্গতদের উপকার হত। এখন পত্রিকায়, টিভিতে পরিযায়ী শ্রমিক কথাটা উচ্চারিত হচ্ছে। কিন্তু আমরা ছোটবেলা থেকে পাখিদের ক্ষেত্রেই এটা শুনে এসেছি – যে পাখিরা বিদেশ থেকে আমাদের দেশে একটা বিশেষ সময়ে আসে। আমাদের দেশের শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এটা ব্যবহৃত হবে ভাবতে পারিনি কখনও। একই দেশের মানুষ কাজের জন্য এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে গেলে তারা হয়ে ওঠেন পরিযায়ী শ্রমিক। এক দেশ, এক বিধান, এক জাতীয় পতাকা, এক জাতীয় সংগীত, এক অধিকার নিয়েই

প্রতিবেদন

মানুষ কাজের জন্য এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে যায়। এটা মানুষের মৌলিক অধিকার, সেটা যে সময়েই হোক না কেন। তা নাহলে দেশের অখন্ডতার অর্থ কি? জানতে ইচ্ছে করে মিডিয়ার কাছে ।

রাজ্যে আসার পর শ্রমিকদের মধ্যে করোনা রোগাক্রান্ত বেশি দেখা যাচ্ছে বলে নিজ শহর অথবা গ্রামে ফিরেও তারা নানা বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। সরকার সবরকম আইন মেনে পরীক্ষা করে বাড়িতে পাঠালেও স্থানীয় মানুষ করছেন প্রবল বিরোধিতা। এই ক্ষেত্রে সব মানুষকে সহমর্মী হয়ে এগিয়ে আসতে হবে। রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার দুর্গত মানুষদের জন্য সাহায্য করছেন, কিন্তু সেই সাহায্য ঠিকমতো আর্তের হাতে পৌঁছাচ্ছে কিনা তা দেখার দায়িত্ব আমাদেরও কম নয়। সবই সরকার করবে আর আমরা ঘরে বসে থাকবো ভাবলে হবে না, আমাদেরও দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। কোন দুর্নীতি দেখলে সরকারকে জানাতে হবে। এতে আমরাও সরকারের লড়াইয়ে সহযোগী হতে পারব। এ ব্যাপারে আমাদের মত অনেক সাধারণ মানুষ এগিয়ে এসেছেন সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য নিয়ে, এটা নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়। নিজের আত্মপ্রচার না করে দুর্গতদের সাহায্যকে প্রাধান্য দিতে হবে রাজনৈতিক নেতাদের। এখন সবাইকে বুঝতে হবে বর্তমান পরিস্থিতি, কত বেদনা নিয়ে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কাজ হারিয়ে ঘরে ফিরছেন। হাজার হাজার

প্রতিবেদন

শ্রমিক অনাহারে-অর্ধাহারে পদব্রজে মাইলের পর মাইল অতিক্রম করে ঘরে ফেরার চেষ্টা করছেন একটু নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য। কতজন বাড়ি ফিরতেই পারেননি – রাস্তায়ই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই আমরা রোগাক্রান্ত হওয়ার ভয়ে তাদেরকে বাড়িতে থাকতে দিচ্ছি না। আমরা নিশ্চয়ই সরকারি আদেশ অনুযায়ী সতর্ক থাকবো। কিন্তু নিজের স্বার্থে তাদের প্রতি নির্মম হয়ে উঠবনা। এই মানবতাটুকু আমাদের থাকা উচিত। বর্তমানে আমাদের এই রাজ্য থেকে প্রায় ২০০ নার্স তাদের নিজ নিজ রাজ্যে ফিরে গেছেন। আমাদের মত সাধারণ মানুষের সহযোগিতার অভাবে অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে এঁদের সাহায্য আমরা হারালাম। আমাদের এখন সবচেয়ে সম্মান করতে হবে ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীদের, যাঁরা নিজেদের বিপদের দিকে না তাকিয়ে করোনায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের বাঁচানোর জন্য লড়াই করে যাচ্ছেন। কিন্তু আমাদের অনেক এলাকাই তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করছে না, এটা অত্যন্ত বেদনার। কত ডাক্তার কত নার্স, কত স্বাস্থ্যকর্মী নিজেদের পরিবার পরিজনের কাছে না গিয়ে দিনরাত হাসপাতালে থেকে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন এই কোভিড ১৯ এর বিরুদ্ধে। তাঁদের প্রতি রাখতে হবে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং তাঁদের পরিবারবর্গের প্রতি এগিয়ে দিতে হবে আমাদের সহানুভূতিশীল কাজের হাতগুলি।

প্রতিবেদন

এবার বলব রাজ্যের পুলিশের কথা। আমরা সাধারণত পুলিশকে এড়িয়ে চলি। পুলিশ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা বিরূপ ধারণা আছে, কিন্তু এবার পুলিশকর্মীরা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে আর্তের সাহায্যে তাঁরাই প্রথম। আমাদের রাজ্যের পুলিশ কয়েকটি ব্যতিক্রমী ঘটনা ছাড়া সামগ্রিকভাবে সকল দিকেই সফল। নিজেদের কাজ দিয়ে তাঁরা দেখিয়ে দিয়েছেন সাধারণ মানুষের বিপদে তাঁরা কত কাছের লোক।

আমি থাকি দক্ষিণ বিধান নগর থানা এলাকার একটি আবাসনে। এই আবাসনের ৭০ ভাগ লোকের ৬০ বছরের উপরে বয়স আমি নিজেও জীবনের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি। বিধান নগর থানার ওসি সুপ্রিয় দাস এবং সেকেন্ড অফিসার অভিষেক আগারওয়াল। আমরা যখনই কোন অসুবিধায় পড়েছি, এনারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। অভিষেক বাবু নিজের ছোট বাচ্চা ও স্ত্রীকে বাড়িতে রেখে সব সময় থানার কাজে নিয়োজিত থেকেছেন। এই এলাকায় কেউ করোনা আক্রান্ত হলেই আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। সব সময় আমাদের সাবধানে থাকতে বলেছেন। থানার অন্য পুলিশকর্মীরাও সাধ্যমত আমাদের সাহায্য করেছেন। আমাদের সাহায্যের জন্য আবাসনের গেটের সামনে একটি পুলিশ-পিকেট ও বসানো হয়েছিল। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে আমাদের পুলিশ সম্পর্কে বিরূপ ধারণা পাল্টাতে পেরেছেন বলে অভিষেক ও

সুপ্রিয় বাবু গর্ববোধ করতে পারেন। থানার পুলিশ কর্মীদের আবাসনের অধিবাসীবৃন্দের পক্ষ থেকে জানাই শ্রদ্ধা।

লকডাউন অবস্থায় দুই মাস বাড়ির বাইরে না যেতে পারায় – পরিবারের মেয়েদের বাড়ির কাজ সামলাতে কি পরিমাণ পরিশ্রম করতে হয় – তা এতদিন পরে উপলব্ধি করতে পেরেছি। সত্যিই বাড়ির মেয়েরা দশভূজা বাড়িতে দুই মাস কোন কাজের লোক ছিল না আমাদের। আমার স্ত্রী ও বৌমা বুঝতেই দেননি, বাড়ির সব কাজ কিভাবে নিজেরা সামলেছেন। ভাবলে অবাক হতে হয়, এমনকি ওঁরা আমার, আমার পুত্রের ও নাতির চুল পর্যন্ত কেটে দিয়েছেন। ঘরের কাজে ও বাইরের কাজে যে ওনারা সমান দক্ষ, তা মেয়েরা লকডাউনের মধ্যে প্রমাণ করে দিয়েছেন।

মাথায় বোঝা, কোলে বাচ্চা নিয়ে মহিলারা শত শত মাইল হেঁটে বাড়িতে ফিরছেন। আবার কোন মহিলা ৫০০ মাইল স্কুটার চালিয়ে তাঁর বাচ্চাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছেন। বেলগাছিয়া বস্তির মত এলাকায় মেয়েরা অগ্রণী হয়ে সব লোকদের বুঝিয়ে করোনার পরীক্ষা করিয়ে ওই এলাকাকে রেডজোন থেকে গ্রীন জোনে নিয়ে এসেছেন। রাজাবাজারের বস্তি এলাকায়ও তাই ঘটেছে। এই লকডাউনে স্বামী ও স্ত্রী আবার অনেক কাছাকাছি এসেছেন। যা গতানুগতিক কাজের চাপে জীবন থেকে হারিয়ে গিয়েছিল, কলেজ জীবনের কথা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা কত স্মৃতিচারণ

নিজেদের মধ্যে। হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি যেন আবার জীবনে ফিরে এসেছে, যা জীবনের শেষ দিনগুলিকে আনন্দময় করে তুলেছে।

করোনার থাবায় পৃথিবীর আর্থিক অবস্থা তলানীতে গিয়ে ঠেকেছে। আমাদের দেশের অবস্থাও একই রকম। কলকারখানা বন্ধ, ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ, লক্ষ লক্ষ বেকার। আমি অর্থনীতিবীদ নই, তবু মনে হয় এই অবস্থা কাটিয়ে উঠতে অনেক সময় লাগবে। আমার মতো বয়স্ক পেনশনভোগী লোকেদের আয়ের সুদের হার অত্যন্ত কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এদিকে লকডাউন তুলে নেওয়ার আগেই সব মদের দোকান খুলে দেওয়া হলো। আমার এক বন্ধু হাসতে হাসতে বলল "মদ এর ওপর ৩০% কর বাড়িয়ে তোমাদের কিছু সুদ দেওয়া হচ্ছে, কর্নাটকে একটি মদের দোকানে এক দিনে এক কোটি কুড়ি লক্ষ (১,২০,০০,০০০/-) টাকার মদ বিক্রি হয়েছে। বুঝতেই পারছ আমরা মদ খাইনা বলে মদ খাওয়ার দল বাঁচবে।" জবাবে বললাম – তাহলে এটা করা যায় চোলাই মদের উপর কর চাপিয়ে প্রকাশ্য ব্যবসা হিসাবে গণ্য করা হোক। তাতে আয় বাড়বে এর সঙ্গে পাড়ায় পাড়ায় লুকিয়ে যে জুয়া খেলা হয় তাকে এর সঙ্গে জুড়ে দিলে আরো ভালো হবে। এতে কোনো বাঁধা নেই কারণ আমাদের মহাভারতের ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরও এই খেলায়

অংশগ্রহণ করেছিলেন। তোলাবাজির ওপর কর বসালে তো সোনায় সোহাগা। কারণ তোলাবাজি এখন পাড়ায় পাড়ায় বড় শিল্প। এই পথেই তাহলে সরকারের আয় স্থিতিশীল হবে। এটা পরিহাস মাত্র। অর্থনীতিবিদরা এ ব্যাপারে সঠিক পথ দেখাতে পারবেন। তাদের হাতেই ভারতের আর্থিক অবস্থার অগ্রগতি সম্ভব।

বর্তমানে লকডাউন তুলে নেওয়ায় করোনা ভাইরাস রোগে আক্রান্তের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে, এখন আক্রান্তের হিসাবে আমরা পৃথিবীর দ্বিতীয়তম দেশ। হয়তো কিছুদিনের মধ্যেই আরো উপরে উঠে যাব। মৃত্যুর হারের হিসাবেও আমরা অনেক এগিয়ে গেছি। এই অদৃশ্য শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই এখনই শেষ হবে বলে আমার মনে হয় না। এই লড়াইয়ে সরকারি নির্দেশ মেনে আমাদেরও অংশগ্রহণ করতে হবে। মাস্ক পরা মনে হয় আমাদের জীবনের অঙ্গ হয়ে থাকবে।

এই লড়াইয়ে আমার ২০০ বছর আগের দু'জনের কথা মনে পড়ছে। তাঁদের প্রদর্শিত পথেই আমরা এগিয়ে যাব, এ ছাড়া আর অন্য পথ নেই। একজন হলেন হাঙ্গেরীয়ান ডাক্তার ফিলিপ সেম্মেলওয়াইজ – যিনি প্রথম প্রমাণ করেছিলেন হাত ধুয়ে পরিস্কার হয়ে রোগীর চিকিৎসা করলে রোগীদের মৃত্যুর হার অনেক কমে যায়। রোগ অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে না। এই ডাক্তারকে বলা হয় 'ফাদার অফ অ্যান্টিসেপটিক'। হাত ধোয়ার প্রচলন তাঁর হাত ধরেই। আরেকজন হলেন সেবার

প্রতিমূর্তি ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল, যিনি হাসপাতালে রোগীর সেবায় হাত ধোয়া ও পরিচ্ছন্নতা নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য বাধ্যতামূলক করেছিলেন। তিনিই প্রথম বলেছিলেন যে রোগীদের ও রোগীর পরিবারের লোকেদের সঙ্গে হাত মেলানো যাবে না। আজ করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ডাক্তার, নার্স স্বাস্থ্যকর্মীদের এবং আমাদের এই পথ ধরেই এগিয়ে যেতে হবে। এই পথই আমাদের লড়াইয়ের পথ। তাহলেই মানবসমাজ বাঁচবে, রোগ ছড়ানোর প্রবণতা কমবে।

এই লড়াইয়ে আমাদের দেশে একটা শুভ দিকও আছে, আমাদের দেশের মানুষ সব ধর্মীয় বিভেদ ভুলে দুর্গতদের সেবায় এগিয়ে এসেছেন। আমরা ভারতবাসী সবাই এই যুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ভাবে সামিল হয়েছি সরকারের নির্দেশ মেনে এ লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। হয়তো এই দীর্ঘ লড়াইয়ে অনেকেই স্বজন হারিয়ে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এগিয়ে যাবেন। এমনও হতে পারে এই সংগ্রামের মধ্যে আমি হারিয়ে যাব। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, “যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে...” কিন্তু মানুষের লড়াই চলবে। মানব সমাজ জয়ী হয়ে পৃথিবীকে এই মহামারীর হাত থেকে মুক্ত করবে। সংগ্রামী মানুষদের ওপর আশা রেখে কবি জীবনানন্দ দাশের কথায় বলবো –

“আমাদের দেখা হোক মহামারীর শেষে
আমাদের দেখা হোক জিতে ফিরে এসে।” ■

স্মৃতি ভেজা রাত

সামিমা খাতুন

স্মৃতির সরণি বেয়ে,
আসে সুখ-দুঃখ ধেয়ে,
ক্ষণিকে হারানো সত্ত্বা,
হিয়ার অতল মাঝার,
জমছে কথার পাহাড়,
হৃদয় কালের বাগদত্তা।

মন খারাপের দেশে,
একলা জাগা শেষে,
সাথী তারার দল।
দুঃস্বপ্নের রেশ,
হয় না নিরুদ্দেশ,
নিদ্রাদেবীর ছল।

ঘিরে থাকা মেঘ,
থমকে আবেগ,
হঠাৎ নামলে বৃষ্টি,
এলোমেলো কেশ,
অগোছালো বেশ,
হাসিটি তবু মিষ্টি ।

রঙিন দিনে ফিরে,
বেঁচে নেওয়া ঘুরে;
রাত্রির যখন শেষ,
ঘুমের দেশের পরী,
ঘোরায় যাদুর ছড়ি,
চোখে ক্লান্তির আবেশ। ■

পাণ্ডুলিপির প্রকাশিত গ্রন্থ

মুল্যঃ ৮০ টাকা [অনলাইনে কুরিওর শুল্ক অতিরিক্ত]

অ্যামাজন লিঙ্কঃ

https://www.amazon.in/gp/offer-listing/8194223695/ref=dp_olp_new_mbc?ie=UTF8&condition=new

এখন কলেজ স্ট্রীটেও পাওয়া যাচ্ছে।

ঠিকানাঃ আদি নাথ ব্রাদার্স, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট

কলকাতা – ৭০০০৭৩ ● দূরভাষঃ +৯১ ৩৩ ২২৪১ ৯১৮৩

নমামি দেবী নর্মদে

শিব দুহিতা নর্মদা

ডাঃ অমিত চৌধুরী

দ্বিতীয় পর্যায় (৪)

আজ ২৭ তারিখ শনিবার আমরা এগিয়ে চলেছি ভেরা ঘাটের দিকে। পরিক্রমার রাস্তা সব সময় ভাল হয় না, মাঠ-ঘাট পেড়িয়ে চড়াই উৎরাইএর মধ্যে দিয়ে সূর্যের প্রখর তেজকে উপেক্ষা করে আমরা ভেরা ঘাট পার হয়ে এলাম লালপুর গ্রামে। একটি পরিবার আমাদের সাময়িক বিশ্রাম এবং সকালে চায়ের ব্যাবস্থা করলো, সকাল দশটায় প্রথম চা পেলাম। বাড়ির দুটো বাচ্চা ছেলেমেয়ে আমাদের সাথে খুব মিশে গেল। আধ ঘণ্টা বিশ্রাম নিয়ে, মা নর্মদার কাছে ওই পরিবারের সার্বিক মঙ্গল কামনা করে আবার হাঁটা শুরু করলাম। শুরু তো করলাম, কিন্তু হাঁটবো কোথা দিয়ে রাস্তা তো নেই, চাষের জমির ওপর দিয়ে জল কাদার ভেতর দিয়ে যেতে হবে। দু'পাশে কুল গাছে পাকা কুল ধরে রয়েছে, মায়ের নাম স্মরণ করে ওই কুলই হল আমাদের প্রাতরাশ। চলার গতি মন্থর হয়ে গেছে। প্রায় কুড়ি কিলোমিটার হেঁটে দুপুর দেড়টার সময় এলাম রাম ঘাটে মৌনী বাবার আশ্রমে।

একটি পাহাড়ের টিলার ওপরে মৌনী বাবা অর্থাৎ কৈলাস ভারতী মহারাজের আশ্রম। তবে এখন উনি আর মৌনী নন।

আমাদের সাদরে গ্রহণ করলেন। আরও চারজন পরিক্রমাকারী ছিলেন। তাঁদের সাথে আমরাও ভোজন প্রসাদ পেলাম। মনোরম পরিবেশ পাহাড়ের ওপর থেকে দেখা যাচ্ছে নর্মদার সাথে দেবগঙ্গা নদীর সঙ্গম। আমাদের শরীরের যা অবস্থা তাতে এই দৃশ্য উপভোগ করতে পারছি না। ভোজনের পর ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম কিন্তু ক্লান্তিকে বেশি প্রশ্রয় দেওয়া যায় না, তাহলে পরিক্রমা বিফল হবে, তাই তিনটের সময় আমরা তিনজন এবং অন্য চারজন চলা শুরু করলাম। অতি দুর্গম পথ, নদীর পাড় ধরে হাঁটতে হাঁটতে বার বার পড়ে যাচ্ছি। নদীর চড়ে গ্রামবাসীরা প্রচুর ফসল ফলিয়েছে এবং তা শহরে পাঠাচ্ছে দেখলাম। জব্বলপুর সড়ক পথে বারো কিলোমিটার। এক সাধুর কুঠিরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম এবং চা খেয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। সাড়ে পাঁচটার সময় একটি শিব মন্দিরে আজকের মত আসন পাতার উদ্দেশ্যে বসলাম। কিন্তু পুরোহিতের অনিচ্ছা এবং আগ্রহহীন ব্যবহার আমাদের দশ মিনিটের মধ্যে উঠতে বাধ্য করলো। সন্ধ্যে হয়ে আসছে অজানা অচেনা জায়গা। দিব্যানন্দজী আছেন এটাই ভরসা। আর চারজন পরিক্রমাকারীর মধ্যে দুজন মাতাজী আছেন। তাঁদের স্নেহশীল ব্যবহার আমাকে বার বার মুগ্ধ করছে। যত সন্ধ্যে হয়ে আসছে আমরা ততই ক্লান্ত হয়ে পড়ছি। নদীর পাড় ছেড়ে আমরা ধরলাম মাঠের রাস্তা।

রাত্রে কোথাও আশ্রয় মিলবে কিনা বুঝতে পারছি না, কিন্তু মাতাজীরা ক্রমাগত আমাদের উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছেন। বহু কষ্টে

নমামি দেবী নর্মদে

পিঠে ব্যাগ সমেত শরীরটাকে নিয়ে এগিয়ে চলেছি। দূর থেকে পাহাড়ের একটি টিলার ওপর তপবনের মত একটি আশ্রম লক্ষ্য করলাম।

তপোবন বললে যে ছবিটা আমরা দেখি, ঠিক সেটা নয়। তবে দূর থেকে তপোবন বলেই মনে হচ্ছিল। তবে রাত হওয়ার জন্য ঠিক মত বুঝতে পারছিলাম না। খুব বড় বড় গাছ আছে, শিব মন্দির আছে। শান্ত পরিবেশ, একটি কম বয়সী ছেলে, যার নাম চন্দ্রশেখর, সে তার স্ত্রী বৈষ্ণবী আর মা ও মেয়েকে নিয়ে সেখানে থাকে। পরিক্রমা করেনি, পরিক্রমাবাসীদের সেবা করে। আজ আমরা ওদের অতিথি। আমাদের সঙ্গে দুই মাতাজী এবং দিব্যানন্দজী নর্মদা মায়ের আরতি করে তাড়াতাড়ি রাতের ভোজন প্রসাদ তৈরির কাজে লেগে গেলেন।

এখানে রাত দশটা থেকে সকাল দশটা পর্যন্ত বিদ্যুৎ থাকে না। তাই আর চারপাশটা আমাদের দেখা হল না। বাড়ি ফেরার উৎসাহ এবং অসম্ভব ক্লান্তি কাকাজীকে অধৈর্য করে তুলেছে, যাই হোক রাত্রে ভোজন প্রসাদ পেয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম। দিনে যেরকম গরম, রাত্রে সে রকম ঠাণ্ডা, তাই আরেকটি বিনিদ্র রজনী কাটল। আজ আমাদের পরিক্রমার শেষ দিন, তাই আমাদের লক্ষ্য যতটা এগিয়ে যাওয়া যায়।

আজ ২৮তারিখ রবিবার, আমরা তিনজন ভোর ছটায় বেরিয়ে পড়েছি। বাকি চারজন আজ এখানে থেকে গেলেন। সূর্যের আলো সেভাবে ফোটেনি। সড়ক ধরে কিছুটা যাওয়ার

পরে মাঠের রাস্তা ধরলাম। ধূ ধূ মাঠ, ঠিক পথে যাচ্ছি কিনা বলে দেওয়ারও কেউ নেই। নর্মদা পরিক্রমা যে তপস্যা অর্থাৎ তাপ সয়া সেটা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি। যে কষ্ট যে পরিশ্রম হচ্ছে তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। প্রায় দু'ঘণ্টার ওপর হাঁটা হয়ে গেছে। একটি চাষের জমির সামনে দাঁড়িয়ে, আমরা কোনদিকে যাবো রাস্তা ঠিক করার চেষ্টা করছি। বেশ কিছুক্ষণ পর একটি ছেলে এসে আমাদের পথের সন্ধান দিয়ে গেল। পথটি মসৃণ নয়, পাহাড়ের চড়াই। এগিয়ে চলেছি, কিছুটা গিয়ে উৎড়াইয়ের পথে একটি নাম না জানা নদীর মতো জল দেখতে পেলাম। হাত মুখ ধুয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে এগোতেই একটি গ্রাম পেলাম, গ্রামের নামটি মনে নেই। আমাদের বিধ্বস্ত অবস্থা দেখে, একটি ছেলে তাদের বাড়িতে গিয়ে চা খাওয়ার অনুরোধ করলো, আমাদের না যাওয়ার কোন কারণ নেই।

তিন ঘণ্টার বেশী হাঁটা হয়ে গেছে। ওদের বাড়িতে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আবার রাস্তায় নেমেছি। কিন্তু হাঁটতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। চলার গতি মন্থর হয়ে গেছে। কাঁধ ও পেশীতে টান ধরছে, দাঁড়িয়ে থাকলে এই সমস্যাটা হয় না। কিন্তু ভারি ব্যাগ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না, তাই বসে পড়ি। এসে পড়েছি ভীকমপুর গ্রামে, এখানে নর্মদা নদী সিনিওর নদীর সাথে সঙ্গম হয়েছে, আমরা নর্মদা নদীকে ডানদিকে রেখে, সিনিওর নদী পেরালাম, হাঁটু সমান জলে। তারই মধ্যে জলে পড়ে গিয়ে আমার সমস্ত কিছু ভিজে গেল। একটি

রেলের ব্রিজ আছে, ওটা পেরলেই নরসিংহপুর জেলায় ঢোকা যায়। কিন্তু আমাদের রাস্তা ওটা নয়। নর্মদা নদীকে ডানদিকে রেখে পাড় ধরে হেঁটে চলেছি।

নদীর পাড়ে ফসল হয়েছে, কেউ কেউ আমাদের অনুরোধ করলো কিছু ফসল নিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু আমাদের সে দিকে লক্ষ্য নেই। প্রায় দুপুর একটার সময় এসে পৌঁছালাম ঝাঙ্গী গ্রামে। ৮/১০ টি পরিবার নিয়ে একটি গ্রাম। নর্মদার ওপরে একটি ব্রিজ আছে, আমরা যে আশ্রমে এসেছি সেটি জব্বলপুর জেলার শেষপ্রান্ত। বাঁকেবিহারী মহারাজ তাঁর আশ্রমে আমাদের আজকের মতো আশ্রয় দিলেন। মাতাজী ছিলেন, সস্নেহে আমাদের নর্মদায় স্নান সেরে এসে প্রসাদ নিতে বললেন। এবারের মতো আমাদের পরিক্রমা এখানেই শেষ। তাই নর্মদাতে গিয়ে পরিক্রমা সমাপ্ত করে আশ্রমে ফিরে এলাম। একটি পাহাড়ের টিলার ওপর আশ্রমটি হওয়ার জন্য অনেকদূর পর্যন্ত নর্মদাকে দর্শন করা যায়। মনোরম, স্নিগ্ধ পরিবেশ। সূর্য ডোবার সাথে সাথেই শীত জাঁকিয়ে বসলো।

"পুষ্পিত কত উপবন হয়ে, ছায়া পথ ধরে কভু বেড়িয়েছে মোর তৃষিত হৃদয়, তৃপ্ত হল না তবু।" ফিরে যাচ্ছি কলকাতায়, যাচ্ছি মানে শরীরটা যাচ্ছে আবার জড়িয়ে পরবো অনেক কাজের ভিড়ে, মনটাকে রেখে গেলাম এই ঋষি মহর্ষীদের তপস্যার স্থান নর্মদায়। তাড়াতাড়ি ফিরে আসার তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কত বিনীদ্র রজনী কাটবে জানি না।

নর্মদে হর।

...সমাপ্ত ■

Photo Details: The River Narmada flows through a gorge of Marble rocks at Bhedaghat in Jabalpur...

Photographer: Karan Dhawan, India

Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marble_rocks_alongside_Narmada_River.jpg

শিকড় (গাঁ গেরামের গপ্পো)

দাদুর বাংলাদেশে আগমন

(৩য় পর্ব)

দীপঙ্কর সরকার (বাংলাদেশ)

পিনুদাদুর ফ্রেশ হওয়া শেষ হলে আমিও ফ্রেশ হলাম। তারপর আমার একটা এক্সট্রা সীমকার্ড দাদুকে দিলাম। দাদু জিজ্ঞেস করলেন, “এবার প্ল্যানটা বলো কোথায় কোথায় যাবে?”

— আজ সারা বিকেল আমার ক্যাম্পাসে; সন্ধ্যার পর পদ্মায়। আজ এতোটুকুই, তারপরের প্ল্যান রাতে ভাবা যাবে। আমাদের ৭৫৩ একরের ক্যাম্পাস খুব হাঁটতে হবে কিন্তু। তুমি জার্নি করে এসেছো পারবে তো?

— আমার তোমাকে নিয়ে টেনশন হচ্ছে দীপুদা। তুমি পারবে কিনা সন্দেহ হচ্ছে; যদি পারো তবেই বোঝা যাবে তুমি আমার নাতি হবার যোগ্য কি না।

— ওকে ডান। চলো এবার খেয়ে আসি।

— আসবো মানে? খেয়ে আর আসবো না। খাওয়া শেষে বেড়াতে বের হবো। বলে হাসতে হাসতে দুজনে খাওয়ার জন্য নীচে নামলাম।

হোস্টেলের নীচে হোটেল থেকে খাওয়া শেষ করে ক্যাম্পাসের

দিকে হাঁটতে লেগেছি। এক এক করে ঘুরিয়ে দেখালাম প্যারিস রোড, শহিদ মিনার, বুদ্ধিজীবী চত্বর, প্যারিস রোড এবং সবশেষে বধ্যভূমি। বধ্যভূমিতে গিয়ে দাদুর চোখে জলে ছলছল করছে। দাদুকে বললাম, "এখানে বোধ হয় না আসাটাই ভালো ছিল।"

অল্প কথায় উত্তর দিলেন, "এই বধ্যভূমির অন্তরালে লুকিয়ে আছে হাজার জীবনের উপাখ্যান; অজস্র মানুষ সাজা পেয়েছেন কেবলমাত্র বাঙালি হবার কারণে।" বধ্যভূমি থেকে ফেরার পথে শহিদ মিনার হয়ে মেইনগেটের দিকে এগোচ্ছিলাম। ততক্ষণে প্রকৃতির বুকে গোধূলি নেমেছে। আবিরের রঙে আকাশ পুরোটা ছেয়ে গেছে। শহিদ মিনারের মাঠ থেকে গানের আওয়াজ ভেসে আসছে। দাদু বললেন, "চলো ওদের সঙ্গে কিছুক্ষণ সময় কাটাই।" গিয়ে দেখি এ্যাপ্লাইড ক্যামিস্ট্রি বিভাগের ছেলেরা কয়েকজন বন্ধু গিটার হাতে গান গাইছে। সবাই মিলে গান গাইলাম, 'মিলন হবে কত দিনে আমার মনের মানুষেরও সনে...'

সত্যিই মিলন হলো এক শরণার্থীর সঙ্গে তাঁর দেশের; নাড়ির সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটলো পুনর্বার। ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা পদ্মাপাড়ের দিকে রওনা দিলাম। দাদু বললেন, "পদ্মার পাড়ে একটি মেয়ের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিবো।" তখন বিশ্বাস হয়নি, হেসে উড়িয়ে দিলাম। পদ্মার পাড়ে গিয়ে দেখি সত্যি সত্যি একটি মেয়ে দাদুর সঙ্গে দেখা করতে

এসেছে। মনে মনে বললাম, “বুড়োর দম আছে।” দেখতে সুশ্রী। পিনুদাদুকে দাদা দাদা বলে সম্বোধন করলেও আমাকে ভাই ভাই বলে ডাকছে ও। শুনতে মন্দ লাগছে না; তা ছাড়া একজন সুন্দরীর বাক্যালাপ পদ্মার জলে ঝংকার তুলছে।

আপুর নাম নুসরাত জাহান। পড়াশুনা করেন রাজশাহী কলেজে। দাদুর সঙ্গে ওনার পরিচয়ও ফেসবুক মারফতে। পদ্মার বুকে নৌকা ভ্রমণের জন্য মাঝিদের ডাক শোনা যাচ্ছে ‘মামা, লৌকায় ঘুরলে আসেন; মাত্র বিশ টাকা; বিশ টাকা।” আমরাও নৌকায় উঠলাম। নুসরাত আপু খোলা গলায় গান ধরলেন, ‘তোমার খোলা হাওয়া, লাগিয়ে পালে...’ তারপর ‘লালন শাহ’ মঞ্চে বসে রইলাম আরও ঘন্টাখানেক। বেশ ফুরফুরে হাওয়া বইছে। পিনুদাদু বললেন, “জানো নুসরাত দীপুটার আর একটু বয়স বাড়লে তোমার সঙ্গে একটি হিল্লে পাকিয়ে দিতাম।”

পিনুদাদুর মুখে কিছুই আটকায় না। কি জানি কি কারণে লজ্জায় লাল হয়ে গেলাম! অবশ্য আমার লজ্জা পাবার মতো কোন বিষয়ই ছিল না। দারুণ এক সন্ধ্যা কাটিয়ে হোস্টেলের দিকে রওনা দিলাম। বারবার সিঁড়ি ভেঙে ওঠানামা করা যায় না। অগত্যা, রাতের খাবার খেয়ে হোস্টেলে উঠলাম।

সিঙ্গেল রুমের ছোট বেডে দুজনের থাকা বেশ কষ্টই হচ্ছিলো তবুও কথায় আছে না ‘হলে পরে সুজন, তেঁতুল

পাতায় ন'জন।' লাগেজটা বেডের পাশে রাখলাম যাতে ওটার উপরও শরীরের ভর দেওয়া যায়। পিনুদাদু গল্পের ঝুলি খুলে দিলেন। দাদু শুধালেন, 'গাঁ গেরামের ছেলে হয়ে গাঁ গেরামের গপ্পো জানো তো দীপুদা?'

— জানি অল্পবিস্তর।

— তাহলে শোনো।

"সে এক আশ্চর্য সময়, সন্ধ্যা নামার কিছুক্ষণ পরেই গভীর রাত নেমে আসে পল্লীগ্রামে। তাড়াহুড়ো করে খেয়ে ঘুমানোর প্রস্তুতি নিতে থাকে গ্রামবাসী। সন্ধ্যার প্রায় ঘন্টা দেড়েক বাদেই নিশ্চুপ নিস্তব্ধ হয়ে যায় পাড়া-গাঁ। মাঝে মাঝে ক্রিং ক্রিং সাইকেল বেলের শব্দ শোনা যায়। বুঝতে বাকী নেই কোন হাটুরে হাট করে বাড়ি ফিরছে। খাওয়া শেষে বায়না করতাম দাদুর সাথে ঘুমানোর; চোখ জুড়ানো, মন ভরানো হা করে শোনার মতো গল্পের দাদুর থলি হতে বেরিয়ে আসতো গাঁ গেরামের গপ্পো; রাক্ষস খোক্কশের গপ্পো; ভূত পেত্নির গপ্পো। শিহরণ জাগানো সে গল্পে মোহিত হয়ে কখন যে ঘুমিয়ে পড়তাম টেরই পেতাম না। এতো লোকালয় সেকালে ছিল না। চারদিকে শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল। বছরে একবারই ধান চাষ হতো। জলের জন্য নির্ভর করতে হতো ঊর্ধ্বাকাশে। কখনো কখনো জমির অবস্থা হতো পাকা বাঙির মতো। 'বাঙি' ফলটাও কেমন যেন উধাও হয়ে যাচ্ছে। জমির এই অবস্থা দেখে কৃষকের মাথায় হাত।

উৎস

বছরে একবার ফসল; সেটাও যদি না ফলে, না খেয়ে মরতে হবে। জল আনার একটাই সমাধান হুদমো হুদমির (দুটি ব্যাঙের বিয়ে দেওয়ার প্রচলিত নিয়ম) বিয়ে দেওয়া। এ যেন রীতিমতো বিয়ের অনুষ্ঠান। দুটি ব্যাঙকে সাজানো হয় হলুদ দিয়ে। সাজানো হয় চালন-কুলা। চালন-কুলায় রাখা হয় পান, সুপারি, দূর্বাঘাস, মিষ্টি, মাটির গুঁড়াসহ বিয়ের উপকরণ। দুই ব্যাঙের পক্ষে বিভক্ত হয়ে কিশোর-কিশোরীরাও সাজে বর্ণিল সাজে। চলে প্রচলিত ভাষায় নাচ-গানের পরিবেশনাও। তারপর হঠাৎ একদিন বৃষ্টি নামলে কৃষকের আনন্দ আর দেখে কে! ব্যাঙের বিয়ের বদৌলতে বৃষ্টি হয়নি ঠিকই; কিন্তু এই সংস্কারকেই বিশ্বাস করে গড়ে উঠেছে গ্রাম্য সংস্কৃতি।

আবার বর্ষা মরশুমে যেদিকে চোখ যায় শুধু জল আর জল। ধান সব জলের নীচে তলিয়ে যায়। কৃষকের কপালে চিন্তার ভাঁজ। ওই সময় বরং চিন্তাকে আড়ালে রেখে মাছ ধরবার উৎসবে মেতে ওঠে গ্রাম্য কৃষক। ঝাঁকে ঝাঁকে ধরা পড়ে হরেক রকমের মাছ। বর্ষার জল নেমে গেলে কৃষকেরা আবার আশায় বুক বাঁধে। কখনো কখনো নতুন ধানের চারা রোপণ করে আবার ফসল ফলায়। এ যেন নিত্যদিন লড়াই করা এক সংগ্রামীর উপাখ্যান।

এখন জঙ্গল আর জঙ্গল নেই। গাঁ গেরামেও ঘন জঙ্গল প্রায় উঠে যাচ্ছে। মানুষের এখন ঘর চাই শুধু ঘর। শহুরে

বাবুরা উয়িকএন্ডে মাঝে মাঝে জঙ্গলে বেড়াতে যান। কিন্তু সে জঙ্গল এখন কোথায়? জঙ্গলেও উচ্চবিলাসী সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন। কৃত্রিম জঙ্গল বানিয়ে গড়ে তোলা হচ্ছে কমার্শিয়াল গেস্ট হাউজ। সেখানে ওয়াইফাই সংযোগ লাগিয়ে বোঝার উপায় নেই যে, মানুষ জঙ্গলে নাকি লোকালয়ে। সব সুবিধা পেয়ে গেলে জঙ্গল আর জঙ্গল থাকে কি? যেন জঙ্গলকে বনসাই বানানো হচ্ছে আর আমরা দিব্যি সেই বনসাইয়ে বিচরণ করে ফেসবুকে ঘুরতে যাওয়ার পোস্ট করছি। এ এক বিচিত্র যুগ! আমরা ৭০ বছর আগের জীবনকে বলি অদ্ভুত; আর ৭০ বছর আগের মানুষ এখনকার জীবনকে বলেন ধ্বংসাত্মক।”

সেই গাঁ গেরামের গপ্পের দাদুর থলি ক্রমশ খুলছে আর আমি মিলিয়ে নিচ্ছি অতীতের সঙ্গে বর্তমানেকে। দাদু জিজ্ঞেস করলেন, “দীপুদা 'গ্রাম বাংলার শব্দ সমাচার' সম্বন্ধে তোমার কোন আইডিয়া আছে?”

— সেটা কিরকম?

— আহ, গেরামের ছেলেপুলে হয়ে এইটুকুন জানো না। বলছি শোন তাহলে...

“শীতের রাত। মৃদু বাতাস বইছে। গ্রাম এতোটাই নিস্তব্ধ বাতাসের শনশন শব্দটিও শোনা যাচ্ছে; অদূরের জঙ্গল হতে মাঝে মাঝে শিয়ালের দল পাল্লা দিয়ে ডাকছে; ঝিঁ ঝিঁ পোকারা গর্তে মুখ লুকিয়েছে; ব্যাঙের এখন শীতনিদ্রায় যাবার সময় তাই

উৎস

ব্যাঙের ঘ্যাঙরঘ্যাঙ ডাক শোনা যাচ্ছে না; দীর্ঘ বিরতি নিয়ে দু'একটা সাইকেল আমাকে ক্রস করে যাচ্ছে; এই নিস্তব্ধতার মাঝে সাইকেলের ক্রিং ক্রিং শব্দ দিনের তুলনায় আরো জোরে কানে গিয়ে ধ্বনিত হচ্ছে। খেঁজুর গাছ হতে টপটপ করে রস পড়ছে। পাখিরা ঘুমোচ্ছে; সকালেই তো উঠতে হবে। পাখিদের কত কাজ! খুব সকালে উঠে ডাকাডাকি করতে হবে; পাখিদের অগাধ বিশ্বাস তাদের ডাক না শুনলে গ্রামের মানুষের ঘুম ভাঙে না। তাই চিরকালীন ডিউটি তাদেরকে পালন করতেই হয়। অবশ্য বেতন নিয়ে তাদের কোন ধর্মঘট নেই; কিছু না পেলেও তারা ডেকে যায়। লেনদেনের ব্যাপার না থাকলে বোধহয় ধর্মঘট জিনিসটা অকেজো!

পাখির বাসা হতে পাখির বাচ্চার কান্নার শব্দ শোনা যায় না, অথচ লোকালয়ে সন্ধ্যার পর পরই যেন ছোটবাচ্চার কান্নার রোল পড়ে যায়। বাচ্চাকে দুধ খাওয়াতে হয় না বলেই হয়তো সন্ধ্যার পর পাখিদের সমাজে ছোটবাচ্চার কান্নাকাটির রেওয়াজ নেই।

রাত আর কতই বা হবে দশটাতেই সারা পাড়া নিশ্চুপ। একটা শুকনো পাতা পায়ে পড়লেও তার মর্মরধ্বনি স্পষ্ট শোনা যায়। অনেকের বাড়িতেই হটপট নেই। বাড়ির কর্তারা দেরী করে বাজার থেকে বাড়ি ফেরেন। গিন্নিরা ভাত রান্না শেষ করে একটা গামলায় ভাতগুলো লেপ মুড়িয়ে ঢেকে রাখেন যাতে গরম থাকে।

উৎস

দু'এক বাড়ি হতে স্বামী স্ত্রীর ঝগড়ার শব্দও কানে আসছে। ভাত রান্না শেষে গিন্নি যেই লেপে প্রবেশ করেছেন; লেপের ওমে উষ্ণ হচ্ছেন এমন সময় বাড়ির কর্তাটি বাজার হতে মাছ নিয়ে হাজির। লেপের ভিতর হতে উঠে গিন্নিকে সেই মাছ ভাজতে হবে। শীতের রাতে লেপ হতে বের হওয়া কি চাট্টিখানি কথা! শুরু হয় ঝগড়া। অবশ্য ঝগড়া ছাড়া দাম্পত্য জীবন পানসে। কিছুক্ষণ পর, ঝগড়া শেষে মাছ ভাজার শব্দ আর মাছের সুঘ্রাণ স্পষ্টত কর্ণ ও নাসিকাকে তাদের আগমন বার্তা জানিয়ে দিচ্ছে।

কিছুক্ষণ পর সেই বাড়ি একেবারে নিশ্চুপ। শীতের রাতে টিনের চালে বৃষ্টির ফোঁটার মতো টপটপ শব্দে শিশির পড়ছে। ঘড়ির কাঁটার টিক টিক শব্দ যেন মধ্য মস্তিষ্কে আঘাত করছে; টিকটিকিরা হয়তো ঘুমিয়েছে নইলে ওদের শব্দ ঠিক কানে আসতো। সব শব্দের সংমিশ্রণে কেমন যেন এক অদ্ভুত মোহাচ্ছন্নে ভাসিয়ে কখন যে ঘুম চলে আসতো বুঝতেই পারতাম না।

ঘুম থেকে উঠতে না উঠতেই কতকগুলো শব্দ আবার মাথায় গিয়ে খেলা করছে। পাখিরা ততক্ষণে নিত্যদিনকার ডিউটির সমাপ্তি টেনেছে। সারারাত ডালি দিয়ে ঢেকে রাখা এক-দু মাসের ছাগলছানা বাইরে বেরিয়ে আসার জন্য তিড়িংতিড়িং করছে। হাঁসেরা প্যাঁক প্যাঁক শব্দে খোঁয়ার হতে বের হবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে; মা মুরগীটা ছোট বাচ্চাদের

নিয়ে পাড়া বেড়াতে শুরু করেছে। অনেক মুরগী হাঁসের বাচ্চা নিয়ে পাড়া বেড়াচ্ছে। গৃহস্থ মুরগীকে বোকা বানিয়ে মুরগীর ডিমের বদলে হাঁসের ডিমে তা দিয়েছিল। তাই এমন প্রকৃতিবিরুদ্ধ আচরণ। অবশ্য মায়েরা বরাবরই উদার। যার বাচ্চাই হোক কোলে পিঠে বড় করা মায়ের বৈশিষ্ট্য।

বড়োরা পাড়ার মোড়ে আড্ডা দিচ্ছে। ছোটরা মার্বেল খেলছে। একটি মার্বেল আরেকটি মার্বেলকে ঠুকে ঠক করে শব্দ করছে। কখনোবা শব্দের তীব্রতা খুব বেশি, আর মার্বেল দুভাগ হয়ে যাচ্ছে। যার মার্বেল সদ্য ভেঙে গেল, তার করুণ মুখের একটা প্রতিচ্ছবি চোখে ভাসছে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশির অদৃশ্য হতে শুরু করেছে। সরিষার হলুদ গালিচা যেন মুড়ে রেখেছে পুরো মাঠ। গুনগুনিয়ে ভ্রমরের দল এসেছে মধু খেতে। অবশ্য ভ্রমরের এই মধু গ্রহণকে লুটে নেওয়া বললে ভুল হবে। কারণ, এই মধু বিলানোতে সরিষারও ধান্দা আছে। ধান্দা ছাড়া মনে হয় বিনিময় ব্যবস্থা অচল। মানুষ তো ধান্দাবাজ হবেই কিন্তু প্রকৃতি নিজেও যে ধান্দাবাজি হবার শিক্ষা দেয় তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ সরিষা-মৌমাছি। তবে, প্রকৃতির ধান্দাবাজিতে মানুষ্যসমাজের উপকার হয়। কিন্তু মানুষের ধান্দাবাজিতে মনুষ্য সমাজের উপকার হয় কি? এখানেই প্রকৃতির মহত্ত্ব; এই জন্যই প্রকৃতি উদার। আমরা মানুষেরা না হতে পারলাম মহৎ, না হতে পারলাম উদার। মেঘের মতো বৃষ্টি

বিলাতে পারিনা; না শস্যের মতো স্বভোজী হতে পারি। কেবল শস্যের পোকার মতো শুষে খেতে জানি। পোকা বলতে পোকার শব্দ কানে ভাসছে; সেসব শব্দ কথন আরেকদিন হবে। ঘুমাও এবার।”

ছোটবেলার শোনা শব্দগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে নিচ্ছিলাম। কেমন ঘোর লাগা সে গল্প। সেদিনের মতো ঘুমিয়ে পড়লাম। ...ক্রমশ ■

বিশেষ ঘোষণা

গুঞ্জনে প্রতি মাসের ১৫ তারিখ পর্যন্তই পরের (মাসের) সংখ্যার জন্য লেখা গ্রহণ করা হয়।

তফাৎ

সন্দীপ বাগ

কতটা তফাৎ হতে পারে
এক জীবন-যাপন থেকে অন্য
কতটা বিলাসী হতে পারে
প্রাচুর্যে ভরা একটা জীবন,
কতটা অসহায় হতে পারে
চরম দারিদ্র্যে থাকা মানুষজন।

কলকাতার চৌরঙ্গীর পঁয়ষট্টি তলার
তালগাছ বাড়ির
এক একটা তলায়
পাঁচ হাজার স্কোয়ার ফুটের
আকাশ ছোঁয়ার দাম সতেরো কোটি থেকে শুরু,
শেষ কোথায় ভাবলে অবাক লাগে।
ঠিক যেমন বিশাল হিমালয়ের সামনে
কিংবা পাহাড় কাঁপানো জলপ্রপাতের সামনে দাঁড়ালে
নিজেকে তুচ্ছ লাগে।

গ্রামের নদীতীরে তালপাতা ঘেরা মাটির উনুনের
কাঠের ধোঁয়ায় বাগদি বুড়ি ফোকলা দাঁতে হেসে
বুড়োর সদ্য ধরা মাছ দেখে যখন বলে,

বাস্তব

পঞ্চাশ গ্রাম তেল না নিয়ে এলে রান্না হবে নি গো,
তিন টাকা বাসের ভাড়া বেড়েছে বলে পোহাতি মেয়েটা
তিন কিলোমিটার হেঁটে ঘর যায়,
কুটুম এলে পাতবে বলে কাঁড়ার পাড়ায় ছোটো বউ
ছেঁড়া চাদরেই বছর ভর কাটিয়ে দেয়..

ঠিক তখনই
ক্লাব, কমিউনিটি হল, সুইমিং পুল, সাতটা গাড়ির পার্কিং
ওই সতেরো কোটির মধ্যে ধরা আছে স্যার,
তবে পঁচিশ কোটি থেকে প্রিমিয়ার রেন্জটা শুরু।
একটু তাড়াতাড়ি করবেন
আর মাত্র একটাই খালি আছে
আগামীকাল থাকবে তো?
বাগদী বুড়ি বাঁচবে তো? ■

ধারাবাহিক গল্প

শেষ রাতের মরীচিকা

স্বাগতা পাঠক

অন্তিম পর্ব

সব্যসাচী বিশু কাকাকে জিজ্ঞেস করল, "হ্যাঁ গো কত টাকা হলো?" বিশু কাকা হেসে বললো, "বেশি না ৫৬ টাকা।" টাকা মিটিয়ে দেবার পর সব্যসাচী ঘুরে দেখল রনি আবার বেঞ্চের উপর বসে পড়েছে।

"আরে ভাই তুই আবার বসলি কেন? বাড়ি যা বললাম না।" সবসাচী একটু বিরক্তি আর ধমক মিশিয়ে কথাটা বললো। বিশু কাকা একটু নরম সুরে বললো, "সব্যসাচী দাদাবাবু, আমি আর রনিদা তো এক রাস্তায় যাবো। তুমি এগোও আমি রনিদাকে পৌঁছে দেবো। সব্যসাচী একটু আশ্বস্ত হল। সে মনে মনে ভাবলো অনেক রাত হয়েছে না হলে আমি ওকে এগিয়ে দিয়ে আসতাম। তারপর রনির উদ্দেশ্যে সে বললো, "ভাই আসি রে, কাল কথা বলছি।"

একটা সিগারেট ধরিয়ে বেরোতে যাবে এমন সময় রনি সব্যসাচীর হাতটা টেনে ধরল। হঠাৎ হাতের মধ্যে যেন একটা ছ্যাঁকা খেল সব্যসাচী। কি মারাত্মক ঠান্ডা, সব্যসাচী সাথে সাথেই ঘুরে তাকালো।

রনি এবার কাঁদো কাঁদো গলায় বললো, "ভাই আমি অদিতির ভালোবাসার দাম দিতে পারলাম না রে। একটা

অপদার্থ হয়ে রয়ে গেলাম। না মা-বাবা, না অদিতি কাউকে এই জীবনে সুখ দিতে পারলাম না। আমার এই জীবনের সত্যি আর কোনো মানে রইল না।"

সব্যসাচী একটু ধমক দিয়ে বললো, "পাগলামো করিস না..! দেখ রাগের মাথায় আর আবেগের বসে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়। তুই এখন ঠান্ডা মাথায় বাড়ি যা।" বিশু কাকু ঝুপড়ি দোকান বন্ধ করতে ব্যস্ত। তার হাতের টর্চের আলোয় রনির মুখটা কেমন যেন শুকোনো শুকোনো লাগছে একদম সাদা, রং বিহীন। ওকে দেখে সব্যসাচীর বুকের ভেতরটা কেমন যেন কেঁপে উঠলো। এতক্ষণ আলোটা দোকানের ভেতরে ছিল, আবছা দেখতে পাচ্ছিল ওর মুখটা। তবে এখন বেস স্পষ্ট দেখতে পেল। বিশু কাকা আলোটা বেঞ্চের উপর রেখে তার ব্যাগ গোছাচ্ছে। না খুব চিন্তা হচ্ছে ছেলেটাকে নিয়ে, কি জানি কোনো রিস্ক নিয়ে লাভ নেই। এই ভেবে সব্যসাচী বলল, "চল .. আমি তোকে বাড়ি অবধি পৌছে দিয়ে আসি।"

রনি ব্যস্ত হয়ে বললো, "না ভাই আমি চলে যেতে পারবো।" তারপর কি যেন একটা মনে হতেই সে আবার বললো, "ঠিক আছে চল তবে আমার সাথে..."

সব্যসাচী, রনি আর বিশু কাকা তিনজন হাঁটতে শুরু করলো। বিশু কাকা ওদের থেকে একটু আগে আগে টর্চ নিয়ে হাঁটছে। সব্যসাচী রনির মন ডাইভার্ট করার জন্য কত

রকম কথা বলছে, কিন্তু রনি একদম চুপ। কিছুদূর গিয়ে বিশু কাকা বলল, "সব্যসাচী দাদা বাবু আমার তো ঠিকানা এসে গেছে এবার এইখান থেকে আপনারা দুইজন যাবেন।" সব্যসাচী বিশু কাকাকে জিজ্ঞেস করল, "সেকি বিশু কাকা তোমার বাড়ি আরেটু এগিয়ে সামনের পাড়াতে না? যতদূর জানি এই চত্বরে তো কোনো বাড়ি ঘর নেই, সামনেই একটা খাল আছে। এইখানে কোথায় যাবে?"

বিশু কাকা এবার একটু ধরা ধরা গলায় বললো, "দাদাবাবু এখন এইটাই আমার ঠিকানা।" সব্যসাচী একটু অবাক হয়ে তাকালো বিশু কাকার দিকে। তারপর বিশু কাকা একটু শুকনো হাসি হেসে বললো, "ইয়ে মানে, না আসলে আগে যে বাড়িতে ভাড়া থাকতাম সেটা ছেড়ে দিয়েছি, এখন এই কাছেই একটা বাড়িতে থাকি।"

সব্যসাচী আর কথা না বাড়িয়ে তার হাতের মোবাইলটার ফ্ল্যাস জ্বালালো। চোখের নিমিষে বিশু কাকা যেন কর্পূরের মতো উবে গেছে! কোনদিকে গেল বুঝতেই পারছিল না সে। সব্যসাচী এক হাতে ছাতাটা ধরে আছে রনি আর নিজের মাথা বাঁচিয়ে আর এক হাতে ফোন। সব্যসাচী ভাবল অনেকক্ষণ থেকে আমি একা একা বকে যাচ্ছি কিন্তু রনি কোনো উত্তর দিচ্ছে না, এবার সে একটু বিরক্ত হয়ে রনিকে ঠেলা দিয়ে বললো, "রনি বললাম তো চিন্তা করিস না এবার একটু মন ভালো কর। এই ঝড়

জলের রাতে আমি তোর সাথে দেখা করার জন্য কোন মুলুক থেকে এলাম আর তুই কিনা মুখটাকে বাংলার পাঁচ করে রেখেছিস, ভালো লাগে বল দেখি?”

রনি কোনো উত্তর দিচ্ছে না দেখে, এবার সব্যসাচী তার এক হাত রনির কাঁধে রাখল। এবার সে একটু বেশীই অবাক হল বৈকি, এমন বৃষ্টির ঝাপটায় রনির শরীরে একটুও জলের রেশ মাত্র নেই। এইদিকে এই ছোট্ট ছাতাতে সব্যসাচীর শরীরের একদিক পুরো ভিজে কাক স্নান হয়ে গেছে।

রাস্তায় কোনো আলো নেই, রনির কাঁধে হাত দিয়ে সব্যসাচী আরও একটা জিনিস অনুভব করল, ওর শরীরটা বেশ শক্ত, সাধারণ মানুষের শরীরের থেকেও অনেক বেশি শক্ত। এর মধ্যে হঠাৎ ওর ফোনটা আবার বেজে উঠল। ‘অমিত ইস কলিং ...’ কল ঢোকার সাথে সাথে মোবাইলের ফ্ল্যাসটা নিভে গেল। কানে ফোনটা নিয়ে সব্যসাচী বললো, “হ্যাঁ রে বল তুই আছিস কোথায়..? সেই দুপুর থেকে ফোন করছি।”

ফোনের অপর প্রান্ত থেকে অমিতের গলা শোনা গেল, “আরে আমিও তো তোকে সেই দুপুর থেকে ফোন করছি তোরও তো পাত্তা নেই।”

— দেখ ওয়েদারের যা অবস্থা তাতে ফোনের নেটয়ার্ক থাকবে না সেটা স্বাভাবিক।

“আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে।” বেশ ব্যস্তভাবে অমিত

শেষের কথাটা বলে উঠল। একটু চুপ করে, অমিত এবার একটু গম্ভীর ভাবে বললো, "শোন যেটা বলার জন্য তোকে ফোন করেছি। তুই হয়তো খবরটা পাসনি।" "কি খবররে ভাই...?" সব্যসাচী জিজ্ঞেস করল।

— আসলে একটা খুব খারাপ ঘটনা ঘটে গেছে। সব্যসাচীর বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল।

— কি খারাপ ঘটনা ?

অমিত ধরা ধরা গলায় বললো, "ভাই রনি আর নেই। "মানে কি বলছিস কি তুই...?" সব্যসাচী শুকনো গলায় কথাটা জিজ্ঞেস করল। "হ্যাঁ ভাই আমি ঠিক বলছি।" অমিত প্রায় কেঁদেই ফেলল কথাটা বলে।

তারপর অমিত এক নিঃশ্বাসে কিছু কথা বলে গেল, "আজ দুপুরের খাওয়ার টেবিলে কাকুর সাথে রনির বেশ তর্কবিতর্ক বাঁধে। এই প্রথম রনি কাকুর উপর রেগে গিয়ে খুব ঝামেলা করে। তর্ক ঝগড়ার পর্যায় চলে যায়। খাবার থালায় রেখে রনি উঠে পরে, আর বেরিয়ে যায় বাড়ি থেকে। তখন বাইরে মুষলধারায় বৃষ্টি আর কালো মেঘ... আর তার সাথেই বার বার বাজ পড়ছে। কাকিমা হাত ধরে টেনে রাখতে পারেন না। রাস্তায় বেরিয়ে আমাকে ফোন করে রনি। বলে বিশুকাকার দোকানে আসতে, কথা আছে। ও খুব উত্তেজিত হয়েছিল – কথা শুনেই বোঝা যাচ্ছিলো। বলছিল ও বাড়ি ছেড়ে দিয়েছে, অদিতির সাথে কন্টাক্ট করে ওকে দেশে

আসতে বলবে, তারপর কোর্ট ম্যারেজ করবে। আমি ওকে অনেক কষ্টে শান্ত করে বলি, ঠিক আছে সব কথা হবে, তুই আগে আমার বাড়ি আয়। তা সে আসতে রাজি না। আমাকে জোর করতে থাকে, বিশু কাকার দোকানে আসার জন্য। তারপর আমি ওকে বললাম, বিশু কাকার দোকানে যাওয়া সম্ভব না, কারণ গত পরশু বিশু কাকার দোকানের সামনে, একটা লরি আর বাসের এক্সিডেন্ট হয় তাতে বিশু কাকার দোকানটা দলা মোচড়া হয়ে প্রায় দশ হাত দুরে গিয়ে পড়ে। আর ওই স্পটেই বিশু কাকা মারা যায়...” কথাগুলো শুনতে শুনতে সব্যসাচী বাকরুদ্ধ হয়ে যায়।” হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসে ওর। অমিত কোনো আওয়াজ না পেয়ে দুবার ‘হ্যালো হ্যালো’ করে। সব্যসাচী একটু একটু স্থিতি ফিরে পেয়ে শুধু বলে, “হুম.. শুনছি।”

অমিত আবার বলে চলে, “তারপর রনি একটু শান্ত হয়ে বলে ঠিক আছে আমি তোর বাড়িতে আসছি। ফোনটা কাটতেও পারেনি, স্পষ্ট শুনলাম একটা বিকট শব্দ। আর তারপরই ফোনটা কেটে গেলো। আমি বুঝতে পারলাম ধারে কাছে কোথাও বাজ পড়ছে। কিন্তু ভাবতেও পারিনি যে এমন কিছু ঘটে যাবে। প্রায় ৩০-৪০ মিনিট কেটে গেলো তখনও রনি আমার বাড়ি এসে পৌছাল না। আমি একটু চিন্তায় পরে গেলাম।”

“নৃপা (অমিতের বউ) আমাকে বলল, ‘তুমি একটু এগিয়ে

গিয়ে দেখে এসো।' বৃষ্টিটা তখন একটু ধরেছিল, একটা ছাতা নিয়ে আমি রনিকে খুঁজতে বের হই মাঝরাস্তায় এসে দেখি ৫-৭ জন লোকের জটলা। এগিয়ে গিয়ে জানতে পারলাম বাজ পড়ে একজনে যুবকের মৃত্যু হয়েছে। একটা চাপা উত্তেজনা বুকের মধ্যে তখন তোলপার করতে থাকে আমার। গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে যাই। হ্যাঁ আমি যা ভেবেছিলাম তাই, রনির ফ্যাকাসে নিথর দেহটা পড়ে আছে রাস্তার পাশে আর মাথার কাছে তার ফোনটা, সেটা জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে বাজ পড়ে। আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। তখনও পুলিশ আর অ্যাম্বুলেন্স কিছুই আসেনি, আমি রনির উপর ঝাপিয়ে পড়লাম। ওকে বুকে নিয়ে কাঁদতে থাকলাম, কিন্তু তখন সব শেষ। আর কিছু করার নেই। তারপর পুলিশ এসে ওর লাশটা নিয়ে যায় আমিও সাথে যাই। সেই দুপুর থেকে আমি হাসপাতালে আছি। ওর বাড়িতে খবর দিই। নৃপাকে ডেকে নিই, সেই দুপুর থেকে তোকে ফোন করে পাচ্ছি না।" এই বলে অমিত থামল।

সব্যসাচী পাথরের মত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অমিত 'হ্যালো হ্যালো' করে গেল। সব্যসাচী ফোনটা কেটে, আবার কাঁপা কাঁপা হাতে ফ্ল্যাশটা জ্বালিয়ে তারপাশে ধরল। না কেউ নেই ও একা দাঁড়িয়ে আছে। আর এটা কোনো রাস্তা নয়, এটা পশ্চিমের বস্তির পাশে খালের ধারে যে মাঠ আছে,

সেই মাঠের মাঝখানে হাঁটু সমান জলে সব্যসাচী দাঁড়িয়ে আছে। বুকের মাঝে হিমেল স্রোত বয়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে এই বুঝি হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে যাবে। চারপাশে আলো ঘুরিয়ে কোথায় কোনো জনমানবের দেখা পেল না সে। সব্যসাচী বুঝতে পারছে না সে কি করবে, কোনদিকে গেলে সে রাস্তা পাবে। দক্ষিণ বরাবর কিছু টালির চালের বাড়ির দেখা গেল, সে সেইদিকে লক্ষ্য করে এগোতে লাগলো। জলের মধ্যে হাঁটার সময় মনে হল কেউ বুঝি ওর পেছন পেছন হাঁটছে। এই বুঝি রনি এসে ওর হাতটা চেপে ধরবে। বৃষ্টিটা ধরে এসেছে কিন্তু চারিদিকে পিচ-কালো অন্ধকার। কিছু দূর এগিয়ে আসার পর সব্যসাচী নিজের ভুল বুঝতে পারল। দূর থেকে যেগুলোকে টালির চালের বাড়ি বলে মনে হয়েছিল, আসলে সেগুলো ময়লার স্তূপ। প্রকান্ড মাঠ, সব্যসাচী ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না কোনদিকে যাবে। উল্টোদিকে ফ্ল্যাশ ঘোরাতে গিয়ে তার নজরে পড়ে আরো কিছু কিছু বাড়ির আকৃতি। সে এখন বুঝতে পারছে না সেগুলো আদতেও বাড়ি-ঘর না শুধু রাত্রির মরীচিকা। কিন্তু বাঁচতে তাকে হবেই। সে এখন কি করবে, কোথায় যাবে বুঝে উঠতে পারছে না। পাগলের মত ছুটতে থাকল সব্যসাচী, ওর বার বার মনে হতে লাগল, এই বুঝি ওর পেছনে রনি বা বিশু কাকা হেঁটে আসছে। সেই সাথেই বারবার একটা ঠান্ডা হাওয়া ওকে স্পর্শ করে যাচ্ছে

আর খুব মিহি সুরে কেউ যেন ওর নাম ধরে ডাকছে। হাঁটু সমান জলের মাঝে হাঁটা মুশকিল। কিন্তু এই অবস্থায় সব্যসাচীকে দৌড়াতে হচ্ছে। সেই একই ভুল, সব্যসাচী বুঝতে পারল, এই রাতের মরীচিকায় আজ ও তলিয়ে যাবে, এটাই বুঝি ওর জীবনের শেষ রাত...

সে প্রায় হাল ছেড়েই দিয়েছিল। এই ধাঁধার থেকে বাইরে বেরোনোর কোনো রাস্তা সে খুঁজে পাচ্ছিল না। মরুভূমিতে মানুষ যেমন জলের খোঁজে বার বার মরীচিকা দেখে দৌড়ে যায় আর নিরাশ হয়ে ফিরে আসে। আর এক সময় এই ভাবে বার বার নিরাশ হতে হতে, শেষে প্রচন্ড তৃষ্ণায় মারা যায়। সব্যসাচীর মনে হচ্ছিল, এই রাতে সেও আশ্রয় খুঁজে পাবার তৃষ্ণায় বার বার ভুল ঠিকানায় ছুটে যাচ্ছে, তারও মৃত্যু আসন্ন। তবুও বাঁচার আশায় ও কতক্ষণ যে এইভাবে ছুটে বেরিয়েছে ও জানে না। এক সময় ও ক্লান্ত হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ওই কাদা ও নোংরার স্তুপের মধ্যে পড়ে যায়।

পরদিন সকালে যখন সব্যসাচীর জ্ঞান আসে তখন ও হাসপাতালের বেডে। চোখ খুলে প্রথমেই ও দেখতে পেল অমিতকে, পাশে নৃপাও দাঁড়িয়ে আছে। এরপর ঘরে ঢুকলেন খাঁকি উর্দি পরা একজন মাঝবয়েসী ভদ্র লোক। এনাকে সব্যসাচী চেনে, ভবানীপুর থানার ছোটবাবু। বেশ ভালো বন্ধুর সম্পর্ক আছে এনার সাথে সব্যসাচীর, নাম

অনিমেষ হালদার। সব্যসাচীর মুখে আগের দিন রাতের সব কথা শুনে অমিত, নৃপা এবং হালদার বাবু পুরোপুরি অবাক হয়ে যায়। সব্যসাচী, পরে হালদার বাবুর কাছে জানতে পারে, বেলা ৯.৩০ নাগাদ আশেপাশের বস্তির কিছু বাচ্চা ওই মাঠের জমা জলে খেলতে এসে সব্যসাচীকে পড়ে থাকতে দেখে লোকজন ডাকে, এবং ওই বস্তির কিছু লোকজনই ধরাধরি করে তাকে এই সরকারী হাসপাতালে দিয়ে যায়। তারপর পুলিশ আসে। ডাক্তার জানায় সব্যসাচীর সারা শরীর প্রচুর ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল। সারারাত জল কাদায় ঘুরে নোংরা আবর্জনার মধ্যে বিভিন্ন পুরনো ভাঙ্গা-চোরা লোহার টুকরোতেই হয়তো পা-হাত কেটেছে। ফোনটাও জলে ভিজে অফ হয়ে গিয়েছিল। অনেক কষ্টে সেটা অন হয়। তারপর সেখান থেকে লাস্ট কল লিস্ট দেখে অমিতের নাম্বারে হালদার বাবু ফোন করেন। পরদিন সব্যসাচী ছাড়া পায় হাসপাতাল থেকে। সব্যসাচীর বাড়িতেও হয়, ওর বাবা আর বোন আসে। যতদিন না সব্যসাচী সুস্থ হয় ততো দিন ওর বাবা আর বোন ওর কাছেই থাকবে।

আজ প্রায় কেটে গেছে মাস সাতেক। রনিকে ওরা খুব মিস করে। এমন কি বিশু কাকাকেও। ওদের সেই জমিয়ে আড্ডাটা আজ আর হয় না। রনির মৃত্যুর খবর সব্যসাচীই দিয়েছিল অদিতিকে। না অদিতি সেটা মেনে নিতে পারেনি। মাস পাঁচেক পরে খবর পায়, অদিতিও অনেকদিন অসুস্থ

থাকার পর মারা যায়। সব্যসাচী খুব আঘাত পেয়েছিল এই সংবাদে। অনেকগুলো দিন পেরিয়ে গেছে, তবুও সব্যসাচীর কাছে আজও সেই শেষ রাতের মরীচিকার স্মৃতিটা খুব স্পষ্ট। সেই স্মৃতি শুধু ভয় না, অনেক বেদনাও নিয়ে আসে। বন্ধু বিচ্ছেদের বেদনা।

...সমাপ্ত ■

রাজত্ব

প্রণব কুমার বসু

রাজা আপনি জেগে? শত্রু যাচ্ছে ভেগে
শত্রু এনেছে যারা - হয়েছে যে দিশাহারা
শত্রুকে যায়না দেখা - আঁকুন গন্ডি রেখা
বাজিয়ে ঘন্টা থালি - দিয়েছে লোকেরা গালি
ওষুধ মেলেনা দেশে - চালান হয়েছে বিদেশে
চিকিৎসা যারা করে - ভয়েতে তারাও মরে
অযোগ্য নানা লোক - মরলেই কিবা শোক
পরিযায়ী কত শ্রমিক - আছে কিছু পশুপ্রেমিক
ফ্রিতে মিলবে চাল - হাফিজ রেশনের মাল
মৃত্যু চলছে বেড়ে - বক্তৃতা হাতটা নেড়ে
রাজার গদিটা শক্ত - খুঁজছে লোকেরা গর্ত
অনির্দিষ্টের পথে - রাজা চড়েছেন রথে
কুটিল রণনীতি - বেড়েছে সবার ভীতি
ভয়ে ভয়ে বেঁচে থাকা - ভরসা ঘুরবে চাকা
বাতিল হয়েছে নোট - জেতার জন্য ভোট
টাকা মেরে যারা বিদেশে - ফিরবে কি আর স্বদেশে
মিলছে যাদের ছাড় - সবাই পগারপার
শিক্ষা দীক্ষা বন্ধ - রাজা যে হয়েছে অন্ধ
লাল, সবুজে ঢাকা - দেশটা হচ্ছে ফাঁকা
রাজার গদিতে টান - চলে যাবে সম্মান। ■

ধারাবাহিক উপন্যাস

চার ঋতু-অধ্যায়

রাজশ্রী দত্ত (নীলাঞ্জনা)

(৩)

বছর দুয়েক আগে পিকুর স্কুলে খুশবু ভর্তি হয়েছিলো। খুশবু তার বাবা-মার সাথে আগে হরিয়ানাতে থাকত। তার বাবার বদলির চাকরি হওয়ার দরুণ বর্তমানে এখন তারা মথুরাতে থাকে। খুশবুর মাও কর্মরতা। তাই প্রায় বেশির ভাগ সময়টাই খুশবুর কাটে তার আয়ার কাছে। নতুন পরিবেশে নতুনভাবে মানিয়ে নিতে একটু অসুবিধা হয়। খুশবুর ক্ষেত্রেও তার ব্যাতিক্রম হয়নি। নতুন স্কুলে সেভাবে কেউ তার বন্ধু হয়নি। একমাত্র পিকুই তার খুব ভালো বন্ধু হয়ে ওঠে। দু'জনে একসাথে এক বেঞ্চে বসে, একসাথে পড়াশুনা করে। আবার টিফিনের সময় পিকুর কাছেই সে শোনে নানান গল্প। পিকু তার দাদুর কাছে যেসব পুরানো দিনের গল্প শোনে। সেই গল্পই প্রতিদিন খুশবুকে শোনায় — প্রকৃতির কথা, পাখিদের কুজনের কথা, গ্রামের মানুষের জীবনযাপনের কথা। খুশবু সেইসব গল্পগুলো গোগ্রাসে গিলে নেয়। হারিয়ে যায় পিকুর গল্পের জগতে। সেগুলোই তার কাছে বড় আপন লাগে। খুব অল্পদিনেই তারা প্রিয় বন্ধু হয়ে ওঠে।

পিকুকে সে তার মনের সব দুঃখ-আনন্দের কথা বলে। খুশবু বলেছিল যে, তার বাবা-মা সারাদিন কাজে ব্যস্ত থাকেন। তার সাথে খেলা তো দূরে থাক, তাঁদের কথা বলারও কোনো সময় নেই। আর যদিও কথা বলেন তো একটা কথাই সবার চেয়ে ভালো ফল করতে হবে। অনেক উন্নতি করতে হবে। খুশবু কি চায় সেটা জানার সময় আর ইচ্ছা কোনটাই হয়তো ছিল না তাঁদের। পিকুর বাড়ির গল্প যখনই শুনত, তার মনে হতো যদি পিকুর মতই তার বাড়ির পরিবেশটা এমন হতো। একটু ভালোবাসা আর স্নেহ এটাই তো একটা শিশুর কাম্য। কিন্তু তার পরিবর্তে তাকে ঘোড়া দৌড়ের মতো জীবন-ময়দানে শুধু দৌড়াতেই বলতেন তাঁরা।

গত সপ্তাহে খুশবুর বাবা-মার মধ্যে প্রবল ঝগড়া হয়েছিল। খুশবু স্কুলে গিয়ে মুখ ভার করেছিল আর গুমরে গুমরে কাঁদছিল। পিকু খুশবুর মন ভাল করার জন্য সেদিন ছুটির সময়ে তাকে নিয়ে গিয়েছিল তার বাড়িতে। পিকুর মায়ের ভালবাসার আদর, পিকুর দাদুর গল্প বলা, সব কিছুই তার মনকে ভালো করে তুলেছিল। বাড়িতে ফেরার সময় সে পিকুকে বলেছিল, “পিকু আমি প্রতি সপ্তাহে শনিবার তোর বাড়ি আসব। তোর বাড়ির লোকের আদর পেতে, তুই যেন হিংসা করিস না। তুই জানিস তো আমার বাড়িতে কারোর সময় নেই আমার সাথে থাকার। আর থাকলেও সেই সময় বাবা-মা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করতে ব্যস্ত থাকে। আমার

ওই বাড়িতে থাকতে মোটেও ভালোলাগে না। খুব একা লাগে। তুই কিন্তু আমার সাথে কোনদিন আড়ি করবি না।"

"নারে খুশবু আমরা সারা জীবন বেস্ট ফ্রেন্ড হয়ে থাকব দেখিস।" পিকু জোর গলায় আশ্বস্ত করেছিল খুশবুকে। এরপর প্রবল বৃষ্টির জন্য ক'দিন স্কুলে যেতে পারেনি পিকু। তারপর আজ স্কুল গিয়েছিল কিন্তু খুশবু স্কুলে আসেনি। আর বাড়ি এসে শুনেছে পিকু – তারা চিরদিনের মতো কলকাতায় ফিরে যাবে। আর খুশবুর সাথে দেখা হবে না এই ভাবতে ভাবতে রাতে পিকু ঘুমিয়ে পড়ে।

ভোরের আলোয় চারিদিকটা রুপোলী সাজে সেজে উঠেছে। পিকুর জানালা দিয়ে এক চিলতে রোদ এসে পড়েছে তার বিছানার ওপর। খুটখাট শব্দে পিকুর ঘুম ভাঙল। পিকুর মা মৃদু গলায় বললেন, "পিকু ওঠো, তৈরি হয়ে নাও। আমাদের বিকালে ট্রেন আছে। মুখ হাত-পা ধুয়ে তৈরি হয়ে নাও।"

এইটা শুনে পিকুর মাথায় বাজ পড়ল। আজই তাদের যেতে হবে! তাহলে খুশবুকে সে কি করে তাদের যাওয়ার খবরটা জানাবে! আর খুশবুর বাবা বা মা কারোর ফোন নম্বরটাও তো নেওয়া হয়নি এতো দিনেও। সে মাকে বলে, "মা, বিকালে ট্রেন তাহলে এখন স্কুল চলে যাই। শেষবারের মতো বন্ধুদের সাথে দেখা করে আসি, আর খুশবুকেও তো জানানো হয়নি যে আমরা চলে যাব।"

পিকুর মা কিছুটা বিরক্তির সুরে বললেন, "কোথাও যেতে হবে না। আর কাউকে জানাতে হবে না। নিজের বইপত্রগুলো গুছিয়ে নাও। অনেক কাজ বাকি আছে।"

দেখতে দেখতে সকাল গড়িয়ে বিকাল হল। বাড়িতে পড়ল মোটা তালা। পিকুর আর খুশবুকে বলা হল না তাদের যাওয়ার কথা। দেখা হওয়ার কিংবা কথা বলার সুযোগও আর রইল না। পিকু একরাশ চোখের জল নিয়ে ট্রেনে চাপল। মনে মনে ঠিক করল একদিন বড়ো হয়ে সে ফিরে আসবে তার এই প্রিয় গ্রামে আর প্রিয় বন্ধু খুশবুর কাছে। প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে ট্রেন এগিয়ে চলল ভবিষ্যতের গন্তব্যের দিকে, পড়ে রইল জীবনের প্রথম অধ্যায়ের টুকরো স্মৃতির খেলাঘর...

...ক্রমশ ■

হ্যাঁ গো, গলত হ্যায়

প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পি.কে.)

প্রায় সবাই জেনে ফেলেছেন
রাজা একটার পর একটা ভুল করছেন
আর ঢপ দিয়ে যাচ্ছেন...

দেখুন না, এইতো ক'দিন আগেও
রাজা মশাইয়ের নাম-ধাম-গুলোও
যাঁদের জানা ছিল না, তাঁরাও
আজকাল কেমন গোঁফ পাকিয়ে
পণ্ডিতি করছেন...

লক ডাউনের বাজার...
পুজো গেল, মন্দ নয়,
ভীড়ভাট্টা তো ছিলই।
রাজা প্রচার করে ছিলেন
ছ'ফুট দূরে থাকতে হবে...
প্রজারা সেই বেদ-বাক্যের একটি সরলীকরণ
করে ছ'ইঞ্চি দূরত্ব বজায় রেখে
ঠাকুর দেখতে বেরলেন।
আরে তা নাহলে যে ঠোঁটে ঠোঁট ঘষে যেত...
ছিঃ যত সব... এ দেশে রাস্তায় ওসব চলে না।

বিভ্রান্তি

যাঁদের পা সর্বদাই একটু বেশি টলমলে
আর মস্তিস্কে পোকারা ঘুরে বেড়ায় হেসে খেলে,
তাঁদের অনেকেই
পুজোর সময় ঘরে টিভির সামনে বসে
বেশ চিকেন-রোল চিবোতে চিবোতে
হোয়াটস অ্যাপে কিংবা ফেসবুকে
একটি রাজ-বিরোধী সংলাপ পোস্ট করে
বিজয় গর্বে পাশে বসে থাকা
বাধ্য-বধূকে একটু চুম্বন করে ফেলেছেন...
থুরি থুরি, এ দেশে প্রাকৃতিক সত্য
প্রকাশ করতে নেই...

এইরকমই একজন মধ্যমবর্গীয় বীরপুরুষকে
সেদিন কিছু প্রশ্ন করছিলাম।
আমি বললাম – এই দোষস্থ রাজার কোন
প্র'টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি' রাজার যুগেও কি
চীন ভারতকে ঘিরে ধরেছিল?
তিনি বললেন – ইডিয়ট, ইতিহাস পড়ো নাই, কথা কইতে আসো...
আমি বললাম – তা সেই সময় সেই রাজা কি করেছিলেন স্যার?
তিনি বললেন – শাট আপ, শান্তি-চুক্তি ছাড়া বুদ্ধিমান রাজারা
আর কি-বা করতে পারেন?
আজ রাজত্ব না থাকলেও তো

বিভ্রান্তি

তাঁর উত্তরসূরীদের মধ্যে সেই ধারা অব্যহত...
আমি বললাম – ক্ষমা করবেন স্যার,
তা সেই রাজার যুগেও কি এ দেশে করোনা এসেছিল?
তিনি বললেন – মুখপোড়া, তখন কাশ্মীরে আরটিক্ল ৩৭০ বলবৎ ছিল,
আসবে কোথা দিয়ে?
এরপর আর কোন প্রশ্ন আমার মাথায় আসেনি।

ফিরে এসেছি,
তবু আজও আমি সারাদিন টিভি না চালিয়েও দেখতে পাই
চাঁদের বুকে আছড়ে পড়া অসহায় বিক্রম-ল্যাণ্ডারটা ছটফট করছে...
একা নই, অনেকের মত আমিও গভীর রাতে একটা স্বাভাবিক ভয় পাই –
হয়তো বা কাল সকালের খবরের কাগজে দেখবো
চেনাব নদীর ওপর গড়ে উঠতে গিয়ে
পৃথিবীর সর্বোচ্চ রেল-ব্রীজের একটা পিলার
কারও টুস্কিতে শুয়ে পড়ছে...

তাই আজকের 'মেহের আলি' হয়ে, ভাঙ্গা গলায়, আমি চিল্লাই
"সব কুছ চলতা হ্যায়"
ইস মিট্টি পর "সব কুছ চলতা হ্যায়"
যাঁরা দেব-দেবীকে মানেন না,

বিভ্রান্তি

তাঁরা প্রাণভরে পূজার বাজার করেন,
পরিবার নিয়ে প্রতিমা দর্শনে বেরোন...
আবার এ দেশে তাঁদের বিরোধীরা
'ভিন'দেশে তাঁদেরই সাথীদের সাথে
এম. ও. ইউ. এ স্বাক্ষর করেন...

"সব কুছ চলতা হ্যায়"
ইয়ে দেশ পর "সব কুছ চলতা হ্যায়"
আবাম কো বেয়াকুফ বানানে কে লিয়ে
ইয়ে দেশ পর "সব কুছ চলতা হ্যায়"
স্রেফ রাফেল আর ব্রহমোস এর শক্তিতে
জবাব দেবার মত কঠিন রাজারাই "গলত হ্যায়..." ■

মটন প্যাটিস এবং স্কোয়ার চিকেন

অমিত নাগ (আমেরিকা)

সে অনেক দিন হলো। আমরা বেড়াতে গেছি মাসির বাড়ি লন্ডন। ঠিক লন্ডন নয়। ট্রেনে এক ঘন্টার পথ, শহরতলীর সাটন অঞ্চলে। সেখানে মাসির বাগানওলা একশো বছরের পুরোনো লাল ইটের তৈরী বাড়ি। বাগানে গোলাপ, আইরিশ, বেড়ায় বুনো লাল গোলাপের ঝাড় ফুটে থাকে। বাগানের গালিচার মতো সবুজ ঘাসে বড় গাছের ছায়ায় লাল রঙের শিয়াল বাচ্চা গুটিসুটি হয়ে ঘুমোয়। খরগোশেরা কান নাড়াতে নাড়াতে এটা সেটা চিবোয়। যেমন নার্সারি স্কুলে বাচ্চাদের বইয়ে ছবি দেখা যায় ঠিক যেন সেই সব দৃশ্য চারপাশে।

আমরা রোজ ট্রেনে চড়ে লন্ডন যাই। রেলপথের দুধারে লাল লাল ইটের দোতলা তিনতলা বাড়ী, ঢালু ছাতের মাথায় তিন চারটে পোড়ামাটির চিমনির ক্লাস্টার। ওপরে ছাইরঙা মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, নীচে ভিজে পথঘাট। লেভেল ক্রসিং পেরিয়ে, দাঁড়িয়ে থাকা সিগন্যাল কন্ট্রোলের বাড়ির সামনে রেল লাইনের ট্র্যাক চেঞ্জ করার লিভার। ছোট ছোট স্টেশনে রট আয়রনের খাম্বার ওপর করোগেটেড টিনের ছাউনি। ছাদ ধরে রাখার ফ্রেমে পুরোনো দিনের ব্যবহৃত টরেটক্কা

নস্টালজিয়া

টেলিগ্রাফ যোগাযোগের শেষ চিহ্ন হিসেবে টিকে থাকা কতকগুলো পোর্সিলেনের ইনস্যুলেটর। ঠিক যেন বর্ষার দিনে বেলঘোরিয়া, সোদপুর, খড়দহ, ব্যারাকপুর পেরিয়ে চলেছি। সারাদিন টেমসের বুকে ক্রুজে চড়ে, লন্ডন টাওয়ার ব্রিজ দেখে, লন্ডন আইজ নাগরদোলা চড়ে, ওয়েস্ট মিনস্টার, পার্লামেন্ট, মাদাম তুসোর মিউজিয়াম হেনা তেনা দেখে বেড়াই। খোলা ছাদের দোতলা বাসে লন্ডনের অফিস পাড়ার বাড়ী রাস্তা ঘাট দেখতে দেখতে তাজ্জব হয়ে যাই। যেন কোলকাতারই ডালহৌসী পাড়া দিয়ে চলেছি। একই বাড়ী, একই রাস্তা। জননেত্রী বলেন কোলকাতা একদিন লন্ডন হয়ে যাবে, দেখো তোমরা। নতুন করে লন্ডন হয়ে যাবার প্রয়োজন ছিল না। সাহেবরা দূরবিদেশে নদীর পাড়ে হোগলা বন ঢাকা জলাজমিতে ফেলে আসা শহরের স্মৃতি পুর্নজাগরিত করতে কোলকাতাকে প্রথম থেকেই দ্বিতীয় লন্ডন হিসেবে গড়েছিলো। ধরে রাখতে পারিনি আমরা।

দিনের শেষে লন্ডন ঘুরে ক্লান্ত হয়ে ট্রেনে মাসির বাড়ি ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে সন্ধ্যে হয়ে যায়। মাসি চা, স্ন্যাক্স, ভাত, তরকারি, মাছ, মাংস রেঁধে রাখে। দিনভর স্যান্ডউইচ, ফিশ এন্ড চিপস, মিডল ইস্টার্ন ইরো, কাবাব খেয়ে ক্লান্ত আমরা সে সব ডাল ভাত তৃপ্তি করে খাই। মাসির রান্নার হাতটি চমৎকার। ফিশ এন্ড চিপস, চাইনিজ, কোরিয়ান, থাই, খেয়ে ক্লান্ত হয়ে মাঝে মাঝে আবদার জানাই, ডালের

সঙ্গে পাঁচমিশালি ঘন্ট খাবো, লাবড়া স্টাইলে। সদাহাস্যময়ী মাসি টুটিনের বাংলাদেশী বাজার থেকে শাক কুমড়ো মুলো বড়ি, আর পাঁঠার মাংস কিনে এনে আমাদের জন্যে যত্ন করে রেঁধে ফেলে শাকের ঘন্ট আর কষা মাংস।

বাড়িতে খাদ্যসুখের কোনো অভাব নেই। বিপদ হয় দিনের শেষে হাক্লান্ত, ক্ষুধার্ত হয়ে লন্ডন থেকে ট্রেনে চড়ার আগের অবস্থায়। তারও সমাধান পাওয়া গেলো এক দিন। লন্ডন ভিক্টোরিয়া স্টেশনে আবিষ্কৃত হলো একটা স্ন্যাকসের দোকান। সেখানে পুরোনো হাওড়া স্টেশনের দোকানের মতো প্যাটিস পাওয়া যায়, আর পাওয়া যায় কেক, পেস্ট্রি, কফি। নানান কিসিমের, নানান শেপ আর সাইজের, নানান রকম পুর ভরা। তার মধ্যে চৌকো দেখতে চিকেন ভরা এক পাউন্ড দামের এক ধরণের প্যাটিস বেশ পছন্দ হলো

নস্টালজিয়া

আমাদের তিন আর সাত বছর বয়েসী ছেলে মেয়েদের। একটা পারিবারিক নামকরণও করা হয়ে গেলো সর্বসম্মতিক্রমে – "স্কোয়ার চিকেন।"

বহুদিন আগে সেই হাওড়া স্টেশনে আত্মীয় স্বজনদের দিল্লি বোম্বের ট্রেনে তুলে দিতে এসে, বিদায়বেলায় খাওয়া প্যাটিস আর নেসক্যাফের স্বাদ। স্টেশনে কাউকে ছেড়ে আসার বেলায় যে বেদনা চিনচিন করে বুকে, যে হারানোর ব্যথা বাজে, সেই ব্যাথার ক্ষতে সান্ত্বনার প্রলেপ ছিল সেই প্যাটিস। প্রতিদিন বাড়ি ফেরার আগে লন্ডন ভিক্টোরিয়া স্টেশনের দোকান থেকে পকেট হাতড়িয়ে স্বর্ণালী রঙের এক পাউন্ড কয়েকটা কয়েন হাতড়ে বের করে, স্কোয়ার চিকেন কিনে চিবোতে চিবোতে বেশ হৃষ্ট চিত্তে বাড়ি ফিরি আমরা সেদিনের পর থেকে।

নস্টালজিয়া

অনেকদিন হয়ে গেছে তার পর। ছেলে মেয়েরা হয়তো স্কোয়ার চিকেনের কথা ভুলেই গেছে এতো দিনে। আমি আর ভুললাম কোথায়! এই ক্ষনে জীবনপথের রেলস্টেশনে দাঁড়িয়ে চেনা পরিচিতদের একের পর এক বিদায় জানিয়ে চলেছি অচিনপুরের দূরপাল্লার ট্রেনে চড়ে। স্মৃতি হাতড়ে উঠে আসা পুরোনো রেল স্টেশনের স্কোয়ার চিকেনের কথা মনে হতে বাড়িতেই বানিয়ে ফেললাম। তবে চিকেন নয়, মাংসের কিমা দিয়ে। গরম গরম মটন প্যাটিস। হাওড়া স্টেশন, লন্ডন ভিক্টোরিয়া স্টেশন সব ভিড় করে উড়ে এসে হাজির আমাদের প্যাটিসে। প্যাটিস তো নয় – যেন ফুলো পালতোলা স্মৃতির জাহাজ ।

সেদিন কথায় কথায় সে সব বলতে ছেলেমেয়েরা হৈ হৈ করে উঠলো। অবাক হয়ে দেখলাম ওদের সবই মনে আছে। ওরা ঠিক করে ফেলেছে, লন্ডন ট্রিপ করবে একটা, এবার অবস্থা ঠিক হয়ে গেলে। কিছু দেখার বা বেড়ানোর জন্যে সে ট্রিপ নয়। স্রেফ লন্ডন ভিক্টোরিয়া স্টেশনে গিয়ে স্কোয়ার চিকেনের স্বাদ আর একবার পরখ করে আসার জন্যে হবে সেই বিশেষ ভ্রমণ। দেখা দরকার তার স্বাদ আগের মত আছে কি না! জরুরী, খুব জরুরী এটা দরকার... ■
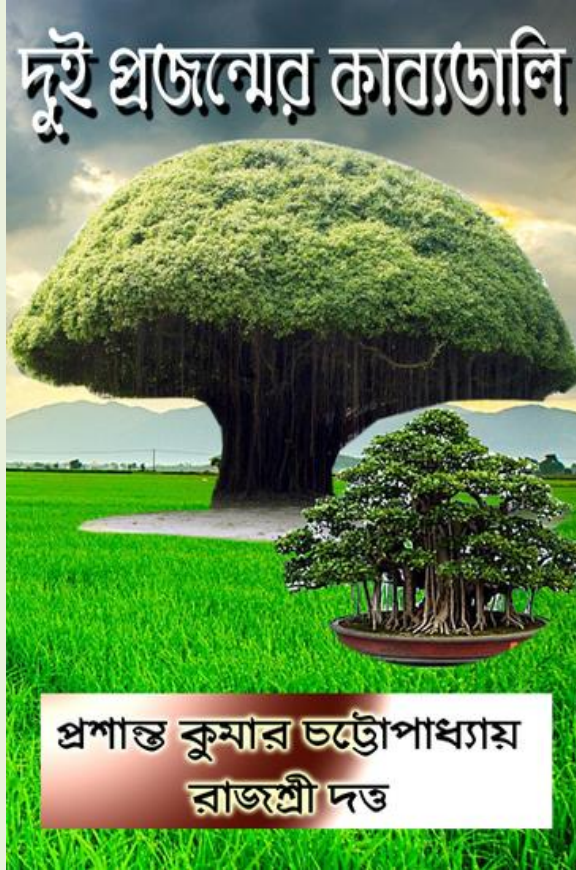
দুই প্রজন্মের কাব্যডালি
প্রশান্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়
রাজশ্রী দত্ত

ভুলুবাবু

অনির্বাণ বিশ্বাস

সকালবেলা সুখনিদ্রা ভঙ্গ হতে ভুলুবাবু ভাবতেও পারেননি তাঁর সামনে কত বড়ো একটা বিপদ আসতে চলেছে। বিপদ বলে বিপদ। তাঁর ঘাড়ে এসে পড়েছে আস্ত একটা পুজোর সমস্ত দায়িত্ব। জমিদার বাড়ির দুর্গাপুজো বলে কথা। এতো কাল তিনি টাকা-পয়সা দিয়েই দায়িত্ব মুক্ত হতেন। কারণ তাঁর দুই ছোট ভাই এতকাল সব সামলে এসেছে। কিন্তু গত কয়েক দিনে তাদের মধ্যে সাংঘাতিক ঝগড়ার পরিণতি হিসাবে তাঁর কাঁধে এসে পড়ে এই বিরাট দায়িত্ব। ভুলুবাবু ওরফে ভোলানাথ সরকার অত্যন্ত শান্ত-শিষ্ট লোক হলেও ব্যবসায়িক বুদ্ধি বেশ চৌখস। কিন্তু তাঁর মিষ্টি ও উপকারি স্বভাবের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী লোকজনের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক বেশ ভালো। কিন্তু তাঁর ভাইদের স্বভাব তাঁর বিপরীত হলেও দাদাকে দুজনেই খুবই শ্রদ্ধা করে। দাদারও ভাইদের প্রতি পুত্রসম ভালোবাসা।

কিন্তু ভুলুবাবুর মস্ত বড়ো দোষ হলো তাঁর ভুলে যাবার রোগ। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা আরও বেড়েছে। সেইজন্য তাঁর দুই ভাই সর্বদা তাঁর সঙ্গে থাকে। কিন্তু এখন বিপত্তি

হলো দুই ভাইয়ের বচসার ফলে তিনি এতো বড়ো কাজে সম্পূর্ণ একা হয়ে গেলেন। সকাল থেকে বারেবারে বোঝানোতেও কোনো ফল না হওয়াতে তিনি নিজেই সমস্ত দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়েছেন।

একথা শোনার পর থেকে সবাই খুবই চিন্তায় রয়েছে – না জানি কি হয়! গিন্নী সৌদামিনীদেবী পুজোর ঘরে খবরটা পাওয়ার পর থেকেই ছটফট করছেন তাঁর স্বামীকে পুরো দায়িত্ব না নিতে দিয়ে দেওরদের একটু বোঝানোর জন্য। কিন্তু ভুলুবাবু রেগে গিয়ে বলেছেন এবারে তিনিই সব দায়িত্ব সামলাবেন। ভাইদের কিছুই করতে দেবেন না।

তার মাঝে আজকেই তিনি এক কাণ্ড করেছেন। তাঁর মেয়ে দুপুরে রৌদ্রে হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়ি এসে মাকে অভিযোগ করে বলছে, "বাবা আমাকে স্কুল থেকে নিতে গিয়ে এক বন্ধুর সাথে দেখা হওয়ায় তাঁর সাথে গল্প করতে করতে, আমাকে না নিয়েই বাড়ি চলে এসেছে জানো? আমি বাইরে বেড়িয়ে কাউকে খুঁজে না পেয়ে চিন্তা করছি তখন সম্পূর্ণার মা আমাকে বললো বাবা রাস্তার ওপারে কার সঙ্গে যেন কথা বলে গাড়ি নিয়ে চলে গেল। ওরা আমাকে পৌঁছে দিয়ে গেল। এই নিয়ে তিনবার একই ঘটনা ঘটলো। মা আমাকে তোমরা গাড়ি পাঠিয়ে দিও। বাবাকে আর পাঠাতে হবে না।"

মেয়েকে মাথায় হাত বুলিয়ে বুঝিয়ে, ঈশারায় তিনি খেয়ে

নিতে বললেন। মুশকিল হলো আজ আবার তাঁর মৌনব্রত। নাহলে তাঁর চারিত্রিক প্রভাবও কিছু কম নয়। কিন্তু আজ তিনি অপারগ। তিনি তাঁর ছোটজাদের তাদের স্বামীদের বোঝানোর নির্দেশ দিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পর তারাও নিরাশ হয়ে এলো। সৌদামিনীদেবী মনে মনে ঈশ্বরকে স্মরণ করে বললেন, "মা তুমি তো জানো আমার স্বামীর কিরকম ভুলো মন। তোমার পুজো এবার তুমিই ব্যাবস্থা করে নিও মা। দেখো যেন মান থাকে।"

যাই হোক ভুলুবাবু পুরো দস্তুর লেগে পড়েছেন পুজো নিয়ে। তাঁর ভাইরা আলাদা আলাদাভাবে তাঁকে সাহায্য করতে এসেছিলো। কিন্তু তিনি কাউকেই কাছে ঘেঁষতে দেননি। এদিকে চাকরদের প্রাণান্ত অবস্থা। কারণ ভুলুবাবুর ভুলো মতির জন্য তাদের হয়রানির একশেষ। দেখতে দেখতে পূজা এসে গেলো। সৌদামিনী লিস্ট মেলাতে গিয়ে কিছুই ঠিকঠাক পাননা। তার জন্য তাঁর স্বামীর সঙ্গে রোজই ঝামেলার শেষ নেই।

একদিন নায়েব এসে বললো, "বাবু, আপনার কোনও আত্মীয়-স্বজনকে তো বললেন না। আপনাকে আমি আগেই মনে করিয়েছিলাম কিন্তু!"

ভুলুবাবু যথারীতি তড়িঘড়ি সবাইকে ফোনে নিমন্ত্রণ করতে বললেন। এভাবেই পুজোর দিন এসে গেলো। ধূমধাম করে পুজো শুরুও হয়ে গেলো। প্রথম দু'দিন ভালো

করে কেটে গেলো। এবারে সন্ধিপুজো একটু রাত করে পড়েছে। সবাই সকাল থেকে পুজো ও লোকজনের তত্ত্বাবধানে ব্যস্ত। তখন রাত প্রায় আটটা। গ্রামের এই রাত মানে অনেকই।

হঠাৎ একটা ফোন পেয়ে সৌদামিনীর মাথা ঘুরে গেলো। ঐ গ্রামেরই উঠতি বড়োলোক পানুবাবু ফোন করে জানালেন, “দিদি নমস্কার, দাদাকে কি বলে যে ধন্যবাদ দেবো। আর বলবেন না আমার বাড়ির হতচ্ছাড়া চাকররা এমন পদ্ম এনেছে যে প্রায় সব পচে গেছে। এত রাতে কোথায় পাবো খুবই চিন্তায় পড়ে গেছিলাম। কিন্তু দাদার একজন লোক হাওড়া থেকে এখানে এতো ভালো ভালো পদ্ম পাঠিয়ে দিয়েছেন কি বলবো? আজ সকালেই ওনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তখন উনি আপনাদের বাড়ির জন্য পদ্মের অর্ডার দিচ্ছিলেন। আমি লোকালই দিয়েছিলাম। কিন্তু দেখুন ওনার ডিশিসন কতো ভালো। কি সুন্দর কোয়ালিটির পদ্ম। উনি আমার জন্যও যে পাঠাবেন ভাবতে পারিনি। মাকে ঐ পদ্ম দিয়ে সুন্দর করে সাজিয়েছি। দাদাকে হোয়াটসঅ্যাপে ছবিও পাঠিয়েছি। আপনাদের কি বলে যে ধন্যবাদ দেবো ভাবতে পারছিনা। সব কাজ মিটলে একদিন আমার বাড়িতে স্বপরিবারে আসবেন। এখন রাখছি তাহলে। ভালো থাকবেন, নমস্কার।”

সৌদামিনীদেবীর হাত থেকে ফোনটা যেন পড়ে যাচ্ছিল।

তিনি কি করবেন এখন ভেবে পাচ্ছিলেন না। বুঝতেই পেরেছেন ভুলুবাবু ভুল করে কথা বলতে বলতে ওনাদের বাড়ির ঠিকানা দিয়েছেন। তাঁর অবস্থা দেখে তাঁর ছোটজারা এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করতে তিনি সব বললেন। শুনে সবারই তো মাথায় হাত। এতো রাতে কোথায় এতো পদ্ম পাবে? সবাই ব্যস্ততায় এ ব্যপারটা নিয়ে কেউ ভাবেইনি। তাঁর ছোটভাইরাও শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো। ভুলুবাবু গরম ফুলকো লুচি দিয়ে আলুর দম সাঁটাচ্ছিলেন। তার মাঝে এই খবর পেয়ে তাঁর খাবার ইচ্ছেটা একটু কমলো।

সৌদামিনী এবার রণচণ্ডী মূর্তি ধরে তাঁর উপরে ক্ষেপে উঠলেন। এর সঙ্গে আগের সব ভুলের ঘটনাগুলোর রোষ উগরে দিলেন। ভুলুবাবু নিজের আত্মপক্ষ সমর্থনের ব্যর্থ চেষ্টা একবার করতে গিয়ে, ততোধিক ব্যর্থ হয়ে শেষে লুচি ভক্ষণে মন দিলেন। ঐ প্রচণ্ড সৌদামিনী-ঝড়ের মাঝে তিনি খাওয়া শেষ করে একটা ঢেঁকুরও তুললেন। তার জন্যও ঝড়ের তাণ্ডব ফণী থেকে আম্ফানে পরিণত হয়েছিল। তাঁকে রক্ষা করার কেউ ছিলোনা। কারণ পুজো-আচ্চার ব্যাপার বলে অনেকেই পিছিয়ে গিয়েছিল। যাই হোক ঘর ভর্তি লোকের সামনে যা অপমানিত হবার তা হলেও ভুলুবাবু খুবই কুল থাকেন। সবচেয়ে কুল ছিলেন পুরোহিতমশাই। কারণ ঐ ঝড়ের মধ্যেও তিনি তারস্বরে চিৎকার করে মন্ত্রোচ্চারণ করে যাচ্ছিলেন। কি কষ্ট করে যে তিনি পুজো

করে যাচ্ছিলেন তা একমাত্র মা দুর্গাই জানেন।

কিন্তু কাজের মাসী খান্তমণি যেই সৌদামিনীকে বললো, “মা, এবারে পুজো কি করে হবে?” সেই কথা শুনে এবং সৌদামিনীর চিৎকার শুনে তাঁর হাত থেকেও মালা পড়ে গেছিলো। সে যাই হোক, তিনি পুজোর ব্রেকে সহকারী পূজারীকে ভার দিয়ে টয়লেটের নামে কিছুক্ষণ বিদায় নিলেন, মাথাটা ঠান্ডা রাখার জন্য। কিছুটা ধূমপানও সেরে নিলেন। এমত পরিস্থিতিতে সবাই যখন হাল ছেড়ে দিয়েছিলো, তখন বাড়ির সামনে একটা গাড়ি এসে থামলো। সেখান থেকে নামলেন ভুলুবাবুর ভাগনা। সে একটু কাজে ব্যস্ত থাকায় এতদিন আসতে পারেনি।

সে বাড়িতে ঢুকেই মামীর চিৎকার শুনে তার স্ত্রীকে আস্তে করে কারণ জিজ্ঞেস করাতে সব জানতে পারে। সব শুনে সে খুব জোরে জোরে হাসতে থাকে। সৌদামিনী একটু অবাক হয়ে তাকে বলেন, “এর মাঝে তোর দাঁতগুলো বার না করলে কি হচ্ছিলনা? আর হবে নাই বা কেন এতো হাসারই কথা! আমারই খালি গা জ্বলে যাচ্ছে।” এই বলে তিনি আর একবার রোষানলে তাঁর স্বামীকে দেখে নিলেন।

“আরে রোষো রোষো মামী, চিন্তা করো না” ভাগ্নে বললো।

সৌদামিনী ঝাঁঝিয়ে বললেন, “না আর চিন্তা করে কি বা করবো? সন্ধিপুজোয় এবারে তো মা আর পদ্ম পাবেন না। মার কি কপাল! হবে না। যাঁর এরকম ভক্ত!”

"মা সব পাবেন, মামী।" ভাগ্নে বললো। সবাই একযোগে বললো "কি করে?" ভুলুবাবুও এতক্ষণে মাথা চুলকাতে চুলকাতে একটু অবাক হয়ে তাকালেন।

"কেন মামা তুমি ভুলে গেলে? আজ সকালে তুমি ফোন করে তো আমাকে পদ্মফুল আনতে বললে, আমি তো নিয়ে এলাম।"

ভুলুবাবু মাথা চুলকাতে চুলকাতে একটু অবাক হয়ে বললেন, "বলেছিলাম তোকে? তা হবে। আমার এখনো ঠিক..."

সৌদামিনী বলেন, "মনে থাকবে কি করে? ওটা মাথা তো নয় ডাস্টবিন।"

বাড়ির সবার মুখেই হাসি ফুটে উঠলো। ভুলুবাবু আবেগে চোখের জল মুছতে মুছতে ভাগ্নেকে জড়িয়ে ধরলেন। পুরোহিত ঝামেলা মিটে গেছে দেখে পুজোয় বসলেন। সবাই মিলে সেই পদ্ম গাড়ি থেকে নামিয়ে ঠাকুর দালানে রাখলো। এক কথায় সবাই উৎসবে মেতে উঠলো।

ভাগ্নে মামীকে বলল, "তবে মামার ভুলো মনের জন্যই দুটো বাড়ির পুজো ধূমধাম করে হচ্ছে। কি ঠিক তো?"

সবাই বললো, "ঠিক ঠিক। ওনার জন্যই পানুবাবুর মতো লোকও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো! ভাবা যায়!"

সৌদামিনীর মাথা এখন ঠান্ডা। তিনি একটু হাসিমুখে মুখটা বেঁকালেন। সন্ধিপুজোর তোড়জোড় শুরু হয়ে গেলো। শুধু ভুলুবাবু আস্তে করে ভাগ্নকে জিজ্ঞেস করলেন, "হ্যাঁ রে, আমি তোকে পদ্ম আনতে বলেছিলাম? ঠিক মনে পড়ছে না তো!"

ভাগ্নে বললো, "ছাড়ো না মামা। মিটে গেছে যখন" ভুলুবাবু একটু জোর করে কিন্তু সবার কান বাঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "আহা! বলই না।" ভাগ্নে মামাকে চুপিচুপি বললো, "আরে মামা, আজ যখন সকালে আমার সঙ্গে কথা বলছিলে তখন আমি শুনলাম তুমি কাকে যেন ফুল পৌঁছে দেবার কি একটা অন্য ঠিকানা বলছো। মনে হলো বড়ো মামা আমার ভুলো মানুষ যদি কোনো গোলমাল হয়, তাহলে বিপত্তি। তাই আমিও একজনকে দিয়ে পদ্মফুল কিনিয়ে কলকাতা থেকে এই আসছি। ভেবেছিলাম না লাগলে পরের দিন পুজোয় এমনিই দেবো। তা মায়ের ইচ্ছায় কাজে লেগে গেলো।"

ভুলুবাবু ভাগ্নেকে আদর করে বললেন, "তা একথা আর পাঁচ কান করে লাভ নেই বুঝেছিস। শোন, আজকের পুজো মিটে গেলে কাল সকালে আমাকে একবার মনে করিয়ে দিস, তোর জন্য সোনার একটা হার রেখেছি। কেমন..." ভাগ্নেও মামাকে ঢিপ করে একটা প্রণাম ঠুকে দিলো।

ভুলুবাবু লজ্জিত হয়ে বললেন, "এই মায়ের সামনে আমাকে প্রণাম নয়। মাকে প্রণাম কর, জয় মা।"

ভাগ্নেও 'জয় মা' বলে প্রণাম করলো। শুধু ভুলুবাবুর চোখ সৌদামিনীর দিকে পড়তে তিনি দেখলেন তিনি তাঁদের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। ভুলুবাবু একটু থতমত খেয়ে মুচকি হেসে মায়ের দিকে মনোনিবেশ করে বারেবারে 'জয় মা, আমাকে দেখো মা' বলে প্রণাম করতে লাগলেন। ধূপ-ধূনো, ফুলের মিলিত গন্ধে ও ঢাকের আওয়াজে চারিদিক মুখরিত হয়ে উঠলো। ■

প্রকাশিত সংখ্যা - ২০১৯

http://online.fliphtml5.com/osgiu/genc/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/zczy/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/btzm/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/fyxj/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/tebb/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/ddla/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/btss/
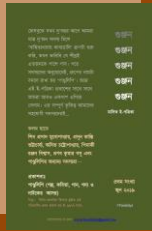
পাঠকদের সুবিধার্থে নিঃশুল্ক বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা **'গুঞ্জন'এর ২০১৯ এ প্রকাশিত সব সংখ্যাগুলির ই-লিঙ্ক পুনরায় দেওয়া হল।**

প্রকাশিত সংখ্যা - ২০২০

http://online.fliphtml5.com/osgiu/kjbd/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/hljw/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/lmjq/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/dadg/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/lgaq/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/tefw/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/eitj/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/vsgw/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/lpsr/
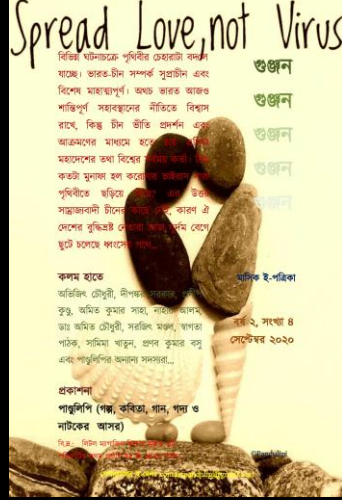
পাঠকদের সুবিধার্থে নিঃশুল্ক বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা **‘গুঞ্জন’এর ২০২০ তে প্রকাশিত সব সংখ্যাগুলির ই-লিঙ্ক এখানে দেওয়া হল।**

অনামিকা

শ্রেয়সী পাঁজা

আমি রাতের আকাশে শোভাবর্ধনকারী সেই
জ্বলন্ত নক্ষত্র হব,
যার মোহময় রূপে আচ্ছন্ন হয়ে থাকবে
তোমার দৃষ্টি,
যার টিমটিমে আলোও তোমাকে আকর্ষণ করবে।
সেই পুরাকাল থেকে কবিদের কলমে যেখানে
সৌর, চন্দ্র আপন মহিমায় ভাস্বর হয়েছে।
তুমি না হয় সেখানে গল্প বলবে বেনামী আমার...
আমায় তুমি নাম দিও অনামিকা।
তোমার কলম হতে নির্গত প্রতিটা শব্দ
নিঁখুতভাবে বর্ণনা করবে আমার রূপের
তোমার সেই সৃষ্টি একদিন নিশ্চিত হবে ইতিহাস।

স্রষ্টা, তুমি তো সেই ইতিহাসে হারিয়ে যাবে একদিন
কালের গতিতে বিলুপ্ত হবে তোমার পদচিহ্ন।
কিন্তু তোমার সৃষ্টির মধ্যেই বিরাজ করব আমি
যুগের পর যুগ আবার তারপরেও
আমাকেই না হয় তুমি তোমার প্রনয়ীর স্থান দিও।
আমরা প্রণয় বিনিময় করব হাজার আলোকবর্ষ দূর থেকে!

অভিলাষ

তুমি স্পর্শ করতে চাইবে আমায়
আর আমি একইভাবে প্রতীক্ষা করব তোমার।
হয়তো মৃত্যুর পর তুমিও কোনো এক ধ্রুবতারকার বেশে
আমার পাশে রইবে
প্রতীক্ষা যদি প্রণয় বৃদ্ধি করে
তবে দূর থেকে আমিও নিঃশব্দে তোমায় প্রত্যক্ষ করব
আর মনে মনে গল্প জমাব,
অপেক্ষার প্রহর শেষে তোমায় বলার জন্য।

আমি হয়তো প্রশ্ন করব তোমায়,
সহস্র নক্ষত্রের ভিড়ে আমিই কেন?
তুমি হয়তো বলবে,
কিছু প্রশ্নের যে উত্তর হয় না অনামিকা
আমি মৃদু হেসে বলব,
কিছু প্রশ্ন উত্তর খুঁজুক তবে।

এভাবেই আদিম যুগ থেকে পৃথিবীর শেষ লগ্ন পর্যন্ত
এবং তারপরেও...
চলবে আমাদের কাহিনী।
নিঃশব্দে, নীরবে, সকলের অগোচরেই
সৃষ্টি হবে ইতিহাস। ■

লোভ বর্জন

পিনাকী রঞ্জন বিশ্বাস

কালে কালে কি যে কাল হলো কি বলবো, তারিখ যদি বা মনে থাকে বার মনে থাকে না, রোজই দেখি রবিবার। রাতে জাগি দিনে ঘুমাই। গতকাল অবশ্য দিনে ঘুমাইনি কাজেই রাতে ঘুম হয়েছে। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে মনটা বেশ ফুরফুরে... বৌমাকে বললাম আজ একটু বিরিয়ানি খেলে হতো না। সে চোখ নাচিয়ে ঘাড় দুলিয়ে বলল, "খুব ভালো হতো, তবে তোমাকে একটু হেল্প করতে হবে।"

রাজী হয়ে গেলাম। জানতে চাইলাম, "কি রকম হেল্প?" বৌমা বলল, "ঐ পিঁয়াজ আর রসুনটা একটু কেটে কুটে দিও।" এ আর কি এমন কাজ! ব্যাগ নিয়ে বেড়িয়ে পড়লাম। পাড়ার হাজি মোল্লার দোকান থেকে মাংস এনে হাত-পা ধুয়ে বৌমাকে বললাম, "কৈ দাও তোমার পিঁয়াজ আর রসুন।"

পিঁয়াজ মরার আগে যে প্রতিশোধ নেয় তা তো জানা ছিলো না। তাকে কাটতে শুরু করেছি আর সে ক্রমাগত টিয়ার গ্যাস ছেড়ে চলেছে। প্রথমে টিসু পেপার, তারপর রুমাল, শেষে গামছা দিয়ে তাকে কন্ট্রোল করতে পারছি না। লজ্জার চোটে বৌমাটিকে কিছু বলতেও পারছি না। কোন

মতে পিঁয়াজ কেটে মুখ চোখ ধুয়ে রসুন ছাড়াতে বসলাম। সে যে ষোড়শী কন্যা তাও জানা ছিলো না। একরকম বলপূর্বক তাকে বিবস্ত্রা করে বৌমায়ের হাতে তুলে দিলাম। বৌমা হাতে নিয়েই বললো, "রসুন ছাড়ানো হয়নি।" আমি পুনরায় তাকে হাতে নিয়ে দেখলাম সত্যিই তো তার অঙ্গে লেপ্টে রয়েছে অতি সূক্ষ্ম অন্তর্বাসের মতো আর একটি খোসা। সে অন্তর্বাস খোলা কি চাট্টিখানি কথা! নখ দিয়ে ছাড়াতে ছাড়াতে মনে হচ্ছে বুড়ো আঙ্গুল আজ দেহ রাখতে চলেছে। ভগবান তোমার একি লীলা খেলা! জামাকাপড় দিয়েছো ভালো কথা, অন্তর্বাস কে পড়াতে বলেছিলো?

এবার পুজোতে ঘর থেকে বেরুনো নাস্তি, তাই ভেবেছিলাম নানা পদ কব্জি ডুবিয়ে খাবো। আজ থেকে খাবার লোভ বর্জন করলাম। খেতে চাইলে খাবার আগেই আবার বিপদ ঘনিয়ে আসতে পারে। ■

মনে পড়ে

শামসুদ্দীন শিশির (বাংলাদেশ)

নেড়া মাথায় দাঁড়িয়ে দিগন্ত বিস্তৃত ধানি জমি, আউশ ধান উঠে গেছে ঘরে। জমিগুলো পেয়েছে কিছুদিনের অবসর। পরবর্তী ফসল লাগানোর আগে কৃষক লাঙ্গল চষে মাটি আলগা করে দিয়েছেন। জমিতে পড়ে থাকা নাড়া পচে মাটিতে মিশে তৈরী হবে সার। কৃষকরা কোন জমিতে কখন চারা রোপণ করবেন, তা ঠিক রেখেই বীজতলায় বীজ বোনেন। এই বীজ বোনার সাথে সাথেই কৃষক তৈরী করে নেন জলপূর্ণ চাষের জমি। হাল গরু দিয়ে জমি চাষের দিন হতে চলেছে বিলুপ্ত। উন্নত চাষ, পর্যাপ্ত ফসলের জন্য কৃষকের আজ পছন্দ ট্রাক্টর। মাত্র ১০/১৫ বছর আগেও হাল, গরু দিয়ে চাষের জমি তৈরী করার জন্য কৃষকের অবলম্বন ছিলো খনার বচন –

"ষোল চাষে মূলা
তার অর্ধেক তুলা।
তার অর্ধেক ধান
বিনা চাষে পান।"

জমি চাষ শেষ হলে জমির মাটি সমান করার জন্য গরু দিয়ে মই টানা হতো। মইয়ের পেছন পেছন সেই জলপূর্ণ কাদা জমি হেঁটে গ্রামের ছেলে-মেয়েরা মইয়ের তলা থেকে

লাফিয়ে ওঠা মাছ ধরতো। সে এক পরম আনন্দ। সারা শরীর কাদায় মাখামাখি। দিনের শেষে পাওয়া নানা ধরনের টাকি, শোল, পুঁটি, ট্যাংরা আর পাবদামাছ কোমরের গামছায় বেঁধে মুখে একরাশ মিষ্টি হাসি আর ক্লান্ত শরীর নিয়ে তাদের ঘরে ফেরা। এ মাছ ধরার আনন্দ, উচ্ছ্বাস অবর্ণনীয়। বিজ্ঞান দিয়েছে বেগ, কেড়ে নিয়েছে আবেগ। গ্রামীণ শিশুদের সে আনন্দ – যা একদিন তাদের কাছে ছিলো অমূল্য – তা আজ চলেছে অস্তাচলে।

জমিতে নুতন ধান রোপনের দু'মাস আগেই ভিটি তৈরি করে কাদা মাটিতে ঘন করে যে বীজধান ছড়ানো হয়েছিল, আজ সেই ধান থেকে আকাশের দিকে মুখ তুলে অঙ্কুরিত ধানগাছের চারা। সে চারা নাবালক হবার আগেই তাদের তুলে নিয়ে গিয়ে রোপন করা হয়, আগে থেকে তৈরী করা নির্দিষ্ট জমিতে। সময় নষ্ট না করার জন্য কৃষক জমির আলে বসেই সেরে নেয় তার মধ্যাহ্নের খাবার। বাড়ি থেকে সে খাবার বয়ে নিয়ে যায় তার সহধর্মিনী নয়তো বাড়ির নাবালক কিশোর-কিশোরীরা। খাবার বলতে থাকে পান্তা ভাতের সাথে কাঁচা অথবা শুকনো লঙ্কা, পেঁয়াজ।

পান্তা ভাতের সাথে কখনও কখনও থাকে সিঁদুল শুটকি দিয়ে তৈরি সুস্বাদু ভর্তা অথবা পান্তা, নারিকেল, গুড় বা কলা। এ খাবার তাঁদের কাছে অমৃত সমান। কতটা তৃপ্তি আর আন্তরিকতা নিয়ে এ খাবার উপভোগ করেন কৃষকরা, যা না দেখলে বোঝা মুশকিল।

আজও সেই শিশুদের কাদা মাখা দেহ, প্রাণের উচ্ছ্বাসে মাছধরা, আর ক্লান্ত দেহে বাড়ি ফেরা মনে পড়ে। আনন্দিত চিত্তে কৃষকদের সেই খাবার গ্রহণের দৃশ্যও খুব মনে পড়ে। হ্যাঁ, ফিরে যাই সেই মাটির টানে। অকৃত্রিম ভালোবাসায় জড়িয়ে থাকা গ্রামের আন্তরিক মানুষ ও অপরূপ সৌন্দর্যে লালিত প্রকৃতির সান্নিধ্যে। ■

পাণ্ডুলিপির প্রকাশিত গ্রন্থ

রহস্য গল্পের প্রাপ্তবয়স্ক পাঠকদের জন্য একটি অবশ্য পঠনীয় গ্রন্থ "রহস্যের ৬ অধ্যায়" প্রকাশিত হয়েছে। আধুনিক যুগের পটভূমিতে, মানুষ কেমনভাবে নিজেনিজেই রহস্যের জালে জড়িয়ে পড়ছে – আর সেই আবর্তে কিভাবে পিষ্ট হচ্ছে, তাই নিয়েই এই ছয়টি গল্পের রচনা। কলেজ স্ট্রীটে 'অরণ্যমন'এর স্টল থেকে বইটি সংগ্রহ করতে ভুলবেন না।

URL: https://www.boichoi.com/RohosyerCharOdhyay

কলকাতার অন্যান্য বুক স্টলেও বইটি পাওয়া যাচ্ছে...

PREVENTION OF COVID - 19
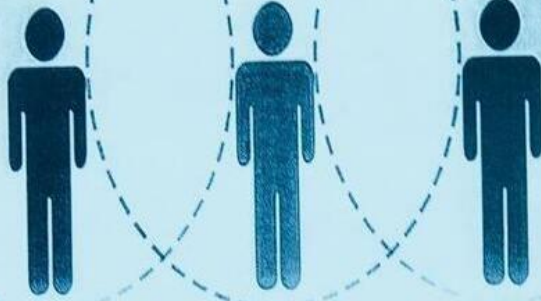
SOCIAL DISTANCING

Photo by Ekaterina Belinskaya from Pexels

PREVENTION OF COVID - 19
Photo by Anna Shvets from Pexels